কৃষিশিক্ষা

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. মোঃ সদরুল আমিন

প্রফেসর মুহম্মদ আশরাফউজ্জামান

প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন ভূঞা

প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল হক বেগ

ড. কাজী আহসান হাবীব

আনোয়ারা খানম

খোন্দকার জুলফিকার হোসেন

এ কে এম মিজানুর রহমান

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, অধিক ফসল ফলনের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৌশলের সাথে পরিচিত করার প্রয়াস নিয়ে **কৃষিশিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদেরকে কৃষির তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক উভয় দিকেই দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আমাদের জীবনে কৃষি

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের জীবনে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কৃষি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর প্রায় সকল উপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহ করে। এছাড়া অন্যান্য পণ্য ও সেবা ক্রয়ের অর্থও কৃষি যোগান দেয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য খাতের চাহিদাগুলো পূরণে আমাদের জীবনে কৃষি তাই ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

কৃষির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো যেমন : ফসল, পশু-পাখি, মৎস্য ও বনায়ন নিয়েই হচ্ছে কৃষির পরিধি।

চিত্র : মাঠ ফসল

চিত্র : সামাজিক বনায়ন (বিদ্যালয়)

চিত্র : গরু

চিত্র : রুই মাছ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাংলাদেশের কৃষির পরিধি এবং পরিসর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষিবিষয়ক তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ -১: কৃষির পরিধি ও পরিসর

কৃষি একটি আদি, আধুনিক এবং অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা। কারণ এর মাধ্যমেই মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো হয়। মানুষের মৌলিক চাহিদা বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাকে বুঝায়। তাই সংগত কারণে কৃষির পরিধি ব্যাপক। ফসল উৎপাদন, পশু-পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ও বনায়ন কৃষির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কৃষি আমাদের খাদ্য যোগান দেয়। ধান, গম, আলু, ভুট্টা, শাকসবজি, ফল-ফলাদি এসব খাদ্য ও পুষ্টি আমরা কৃষি থেকে পাই। পাট, তুলা ও রেশম থেকে কাপড় তৈরির সুতা পাই। কাঠ, বাঁশ, খড়, শন, গোলপাতা ইত্যাদি থেকে গৃহনির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র পাই। বাঁশ, খড়, গবাদি পশুর গোবর, গাছের ডাল ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি। কাঠ ও আখের ছোবড়া, বাঁশ ইত্যাদি থেকে কাগজ পাই। আমলকী, হরতকি, বহেরা, থানকুনি, বাসক ইত্যাদি থেকে ঔষধ পাওয়া যায়। দুধ, মাংস, ডিম এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার আমরা পেয়ে থাকি পশু-পাখি পালন করে। আর এসবই হলো কৃষি। খাদ্য উৎপাদন এবং বস্ত্র, বাসস্থানের উপাদান সরবরাহ করে থাকেন কৃষক। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন কৃষিনির্ভর। তাই কৃষির উন্নয়ন হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

আমাদের এই মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো হয় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি প্রতিপালন, মৎস্য চাষ ও বনায়নের মাধ্যমে। বিভিন্ন ফসল বলতে মাঠ ফসল: দানা, তেল, আঁশ, পানীয়, ডাল ও উদ্যান জাতীয় ফসলকে বুঝায়। পশু-পাখি প্রতিপালন বলতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন এবং পশু খাদ্য উৎপাদনকে বুঝায়। মৎস্য চাষ বলতে বদ্ধ ও মুক্ত জলাশয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতের মাছের চাষকে বুঝায়। আর বনায়ন বলতে প্রাকৃতিক বনায়ন, সামাজিক বনায়ন এবং কৃষি বনায়নকে বুঝায়।

চিত্র : ধান ক্ষেত

চিত্র : পাট ক্ষেত

চিত্র : গম ক্ষেত

কাজ : পরিবারের প্রতিদিনের গৃহীত খাদ্যের আলোকে কৃষির পরিধি চিহ্নিত কর।

পাঠ -২ : ফসল, মৎস্য, পশু-পাখি ও বনায়ন

পূর্বোক্ত পাঠে আমরা কৃষির পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উক্ত পাঠে আমরা কোন কোন বিষয় কৃষির অন্তর্ভুক্ত তা জানতে পেরেছি। এখন আমরা ফসল, মৎস্য, পশু-পাখি, বন ও বনায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

(ক) ফসল : ফসল উৎপাদন কৃষি কর্মকাণ্ডের মূল বিষয়। মানুষের খাওয়া ও পরা অর্থাৎ বেঁচে থাকা ফসল উৎপাদনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চাষের উপর ভিত্তি করে ফসলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা - মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল।

চিত্র : ফলের ঝুড়ি

(i) মাঠ ফসল : মাঠ ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভুট্টা, পাট, তুলা ইত্যাদি। ধান, গম, ভুট্টা হলো দানা জাতীয় ফসল। দানা জাতীয় ফসল মানুষের প্রধান খাদ্য। দানা জাতীয় ফসল আমাদের শর্করার জোগান দেয়। মসুর, মাষকলাই, মুগ ইত্যাদি ডাল জাতীয় ফসল আমিষ সরবরাহ করে। তেল জাতীয় ফসলের মধ্যে রয়েছে তিল, সরিষা, তিষি, সূর্যমুখী ইত্যাদি। এসব ফসল আমাদের খাদ্যের স্নেহ জাতীয় উপাদান সরবরাহ করে। পাট হচ্ছে আঁশ জাতীয় ফসল। পাট আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল। পানীয় জাতীয় ফসল হচ্ছে চা, কফি।

(ii) উদ্যান ফসল : সারা বছরই কৃষকেরা উদ্যান ফসল উৎপাদন করেন। উদ্যান ফসলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফল, ফুল, মসলা ইত্যাদি। লাউ, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, আলু ইত্যাদি শীতকালের প্রধান সবজি। চাল কুমড়া, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, কচু, পটল, করলা ইত্যাদি গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের সবজি। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মৌসুমি ফল। আবার পেঁপে, নারিকেল, কলা ইত্যাদি সারা বছর পাওয়া যায়। শাকসবজি ও ফল থেকে আমরা ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ পেয়ে থাকি। সুতরাং বলা যায় ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে আমরা বেঁচে থাকার জন্য প্রায় সকল খাদ্য উপাদানই পেয়ে থাকি।

(খ) মৎস্য : মাছ আমাদের রূপালি সম্পদ এবং আমিষের প্রধান উৎস। প্রাণিজ আমিষের সিংহভাগ (৬০%) আমরা মাছ থেকে পাই। মাছ আমাদের প্রিয় খাদ্য। তাই আমাদের বলা হয় মাছে-ভাতে বাঙালি। বাংলাদেশের মাটি ও পানি মাছ চাষের জন্য উপযোগী। এ দেশে চাষযোগ্য মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, চিংড়ি, থাইপাঙ্গাস, সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প, সরপুঁটি, তেলাপিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ থেকে চিংড়িসহ অনেক প্রজাতির মাছ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাছ চাষের অনেক প্রযুক্তি বের করেছে। এসব প্রযুক্তির বিস্তার ঘটায় দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দৈনিক মাথাপিছু মাছের চাহিদা প্রায় ৫৬ গ্রাম। তবে আমরা দৈনিক মাথাপিছু প্রায় ৫২ গ্রাম মাছ পেয়ে থাকি।

(গ) পশু-পাখি : কৃষি কর্মকাণ্ডে বিরাট অংশ জুড়ে আছে পশু-পাখি প্রতিপালন। পশু-পাখি ছাড়া ফসল উৎপাদন ও পুষ্টির কথা ভাবা যায় না। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি অন্যতম। তন্মধ্যে গরু ও মহিষ হালচাষ ও ভারবাহী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে যান্ত্রিকশক্তি পশু-পাখির স্থান দখল করলেও এখনও আমাদের দেশে পশুশক্তির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি। কৃষকেরা হালচাষের কাজে গরু-মহিষ ব্যবহার করছেন ব্যাপকভাবে। পাড়াগাঁয়ের পণ্য আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে গরু-মহিষের গাড়ি।

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া পালন করে আমরা দুধ ও মাংস পাচ্ছি। অন্যদিকে হাঁস-মুরগি, কবুতর, তিতির- এগুলো পালন করে আমরা মাংস ও ডিম পাচ্ছি।

(ঘ) বন ও বনায়ন : গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত এলাকাকেই আমরা বন বলি। আর যে পদ্ধতিতে বন তৈরি হয়, তা-ই হলো বনায়ন। আমরা জানি, প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। গাছপালা অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। আবার প্রাণী কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে। কাজেই প্রাণীকে বাঁচতে হলে গাছপালাকে বাঁচাতে হবে। কোনো দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য সে দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার। বনে বিভিন্ন ধরনের পাখি, পশু, কীটপতঙ্গ থাকে। বনের মাধ্যমে একদিকে কাঠ ও জ্বালানির চাহিদা পূরণ হয় এবং অন্যদিকে পরিবেশ ভালো থাকে।

কাজ : কৃষির পরিধির আলোকে তোমাদের এলাকায় উৎপাদিত উদ্যান ফসল, মৎস্য, পশু-পাখি এবং বনের গাছপালার একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : দানা জাতীয় ফসল, আঁশ জাতীয় ফসল, উদ্যান ফসল, মাঠ ফসল।

পাঠ-৩ : কৃষিবিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস

অভিজ্ঞ কৃষক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কৃষকদের কৃষিবিষয়ক তথ্যাদি ও সেবা দিয়ে থাকেন। নিচে কে কীভাবে সেবাদান করেন তা আলোচনা করা হলো।

চিত্র : কৃষক সভা

(ক) অভিজ্ঞ কৃষক : অভিজ্ঞ কৃষক একজন স্থানীয় নেতা এবং একজন পরামর্শদাতা। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন ও নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন। এছাড়া তিনি গণমাধ্যম থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ফলে তিনি স্থানীয় তথ্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা যখন এলাকা পরিদর্শনে যান, তখন অভিজ্ঞ কৃষকের শরণাপন্ন হন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই কৃষকদের গৃহ ও খামার পরিদর্শন করেন এবং মাঝেমধ্যে কৃষক সভা ও উঠান বৈঠক করেন। এভাবে অভিজ্ঞ কৃষকেরা কৃষি জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করেন। অতঃপর তিনি নিজ এলাকার কৃষকদের কৃষি বিষয়ে পরামর্শ দান করেন। কৃষকেরা ফসল নিয়ে নানা সমস্যায় ভোগেন। যেমনঃ ফসলের রোগ হওয়া, কীটপতঙ্গ আক্রমণ করা, বন্যা ও খরা দেখা দেওয়া ইত্যাদি। এসব প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য প্রাথমিকভাবে কৃষকেরা অভিজ্ঞ কৃষকের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। আর তিনিও আন্তরিকভাবে যতটুকু জানেন সে মোতাবেক কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

(খ) কৃষিবিষয়ক অধিদপ্তরসমূহ : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা যার যার অবস্থান থেকে কৃষকদের তথ্য প্রদান ও সেবা দিয়ে থাকেন। তারা নির্দিষ্ট প্রযুক্তির উপর পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট তৈরি করে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। আবার রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমেও কৃষিতথ্য প্রচার করেন। কৃষিতথ্য প্রচারের জন্য 'কৃষিতথ্য সার্ভিস' নামে একটি সংস্থা আছে। সম্প্রসারণ কর্মীরা কৃষকদের খামার ও গৃহ পরিদর্শন করেন। কৃষকদের সাথে সভা করেন। নতুন প্রযুক্তি বা পদ্ধতি প্রদর্শন করেন এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল প্রদর্শন করেন। এছাড়া তারা কৃষি মেলার আয়োজন করেন ও কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো, কৃষকেরা কৃষি সমস্যা নিজেরা চিহ্নিত করেন। যার কিছুটা সমাধান নিজেরা দিতে পারেন। যেসব সমস্যার সমাধান কৃষকেরা দিতে পারেন না, কেবল সেগুলো সম্পর্কে সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। এ স্কুলের মাধ্যমে কৃষকদের সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

(গ) স্থানীয় কৃষি অফিস : বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় কৃষকদের সেবা প্রদানের জন্য কৃষি অফিস, প্রাণিসম্পদ অফিস, মৎস্য অফিস আছে। এসব অফিস দক্ষ কৃষিবিদ দ্বারা পরিচালিত। অফিসের তৃণমূল কর্মীরা কৃষকদের সাথে সভা করেন। সভায় কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং সমাধান দেওয়া হয়।

চিত্র : কৃষি মেলা

(ঘ) কৃষি মেলা : কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি, কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত কৃষিপণ্য একসাথে একমাত্র কৃষি মেলার মাধ্যমেই দেখা সম্ভব। গ্রামের মতো শহরেও এ ধরনের মেলার আয়োজন খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এ মেলায় এক নজরে নানা ধরনের ফসল দেখা সম্ভব হয়। এই মেলায় চারা, বীজ, সার, কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদি দেখানো ও বিক্রি করা হয়। এ মেলায় কৃষিবিষয়ক নানা লিফলেট, পুস্তিকা, বুলেটিন, পত্রিকা প্রদর্শিত হয় এবং বিনামুল্যে দর্শকদের দেওয়া হয়। এতে কৃষি কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও উপস্থিত দর্শকগণও কৃষি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হন। সুতরাং কৃষিবিষয়ক তথ্য পেতে কৃষি মেলার বিকল্প নেই।

কাজ : তোমাদের এলাকায় কৃষিবিষয়ক তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎসগুলো দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

পাঠ-৪ : কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

(ক) কৃষিশিক্ষা: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে কৃষিশিক্ষা দেওয়া হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনেক আগে থেকেই কৃষিশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

চিত্র : গবেষণা প্রতিষ্ঠান

উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার সাথেও কৃষিশিক্ষা যুক্ত করা হয়েছে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা লব্ধ কৃষি জ্ঞান কৃষিকাজে ব্যবহার করে থাকেন। বাংলাদেশে ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আছে। এছাড়াও প্রাইভেট কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আছে। কারিগরি বোর্ডের একাডেমিক অধীনে থেকে ইনস্টিটিউটগুলো ৪ বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা প্রদান করে থাকে। উচ্চতর কৃষিশিক্ষার জন্য বাংলাদেশে ৫টি সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। দুটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ চালু আছে। তাছাড়া রাজশাহী ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়েও কৃষি অনুষদ চালু আছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি অনুষদ হতে কৃষিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয়।

(খ) কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশে অনেকগুলো কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বেশিরভাগ গবেষণা প্রতিষ্ঠানই নির্দিষ্ট ফসলের উপরে গবেষণা করে থাকে। যেমনঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ধানের উন্নত জাত ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট উন্নয়নের জন্য যাবতীয় গবেষণা করে। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ইক্ষু উন্নয়নের জন্য যাবতীয় গবেষণা করে থাকে। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন ফসলের উপর গবেষণা করে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত মেধাবী কৃষিবিদগণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগদান করেন। তারা গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এর ফলে কৃষকেরা উন্নতমানের ফসলের বীজ, নতুন জাত, রোগ ও কীটপতঙ্গের প্রতিকারসহ নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। ফসল সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রাণী ও মাছের উপর গবেষণার জন্য রয়েছে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট। এই গবেষণার ফলে প্রাণী পালন ও মাছ চাষের অনেক প্রযুক্তি উদ্ভাবন হয়েছে। এর ফলে প্রোটিন ব্যবসার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সকল কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণার ফলাফল সম্পর্কিত লিফলেট, পুস্তিকা প্রকাশ করে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।

(গ) কৃষি বিজ্ঞানী : কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যিনি গবেষণা করে নতুন নতুন জাত প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন, তিনি কৃষি বিজ্ঞানী। তিনি একটি ফসলের জীবনচক্র সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং তাঁর নিকট কৃষি বিষয়ক নানা প্রকার তথ্য পুঞ্জীভূত থাকে। তাঁরা নতুন ফসল ও প্রাণীর উন্নত জাত উৎপাদন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দেশের কল্যাণ সাধন করছেন।

কাজ : কৃষিক্ষেত্রে কৃষি গবেষণাগুলোর অবদান দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর

নতুন শব্দ : কৃষক মাঠ স্কুল, অভিজ্ঞ কৃষক, উঠান বৈঠক, অনুষদ, কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি মেলা।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ফসল উৎপাদন ....কর্মকান্ডের মুল বিষয় ।

২. মাছ .... প্রধান উৎস ।

৩. ডাল জাতীয় ফসল ....সরবরাহ করে ।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের	প্রায় ৫৬ গ্রাম ।
২. বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাছের চাহিদা	সার্বিক উন্নয়ন কৃষিনির্ভর ।
৩. আমিষের চাহিদার সিংহভাগ	আমরা মাছ থেকে পাই ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উদ্যান ফসল কাকে বলে?

২. কাদের দ্বারা মানুষের মৌলিক চাহিদা পুরণ হয়?

৩. আমাদেরকে মাছে-ভাতে বাঙালি বলা হয় কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কৃষির পরিধি আলোচনা কর ।

২. কৃষি মেলা কৃষিবিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস-কথাটি বুঝিয়ে লেখ ।

৩. পাঁচটি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম ও এদের কাজ লেখ ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট নিচের কোন ফসল নিয়ে গবেষণা করে?

ক. ধান খ. পাট

গ. আখ ঘ. তুলা

২. আমাদের দেশের কৃষির উন্নয়ন ঘটলে-

i. মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে

ii. দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটবে

iii. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

চিত্র : ক

চিত্র : খ

ক. মাঠ ফসল কাকে বলে?

খ. কৃষিই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে? ব্যাখ্যা কর ।

গ. চিত্র 'ক' এর ফসলটি কোন ধরনের? এর কারণ ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. অর্থনৈতিক বিবেচনায় চিত্রের কোন ফসলটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ? এ সম্পর্কে তোমার মতামত তুলে ধর ।

২ । মীর হোসেন সাহেব তার বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফুল ও ফলের বাগান করেন । বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ সমস্যায় পড়লেও উপযুক্ত পরামর্শের অভাবে বাগান থেকে ভালো ফলন পাচ্ছিলেন না । গত বছর তার জেলা শহরে অনুষ্ঠিত কৃষি মেলায় গিয়ে কৃষিবিষয়ক বহু তথ্য বাস্তবে দেখেন ও পড়ার জন্য নিয়ে আসেন । এতে তার বাগানের উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান করেন । পরবর্তীতে তিনি প্রতিবেশীদের সাথে তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন ।

ক. কৃষিবিষয়ক একটি সমস্যার নাম লেখ ।

খ. অভিজ্ঞ কৃষকের জন্যই কৃষি চলমান আছে ব্যাখ্যা কর ।

গ. মীর হোসেন সাহেব মেলার অভিজ্ঞতা কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন তা ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. মীর হোসেন সাহেবের প্রতিবেশীদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলাফল বিশ্লেষণ কর ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি

কৃষিকাজ করার জন্য যেসব ধারণা, পদ্ধতি, যন্ত্র বা জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয়, সেগুলোই হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি। কৃষির যেমন বিভিন্ন শাখা আছে, তেমনি শাখাভিত্তিক প্রযুক্তিও উদ্ভাবন হচ্ছে। কতকগুলো প্রযুক্তি আছে প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আবার কতকগুলো প্রযুক্তি আছে যা দশ বছর আগে ছিল, এখন তার জায়গায় এসেছে নতুন প্রযুক্তি। লাঙল-জোয়াল প্রাচীন কৃষিযন্ত্র হলেও বাংলাদেশে এর ব্যবহার এখনও চলছে। আবার মালা একটি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত হলেও এর জায়গা এখন দখল করেছে আরও উচ্চ ফলনশীল ধানের অন্যান্য জাত। এভাবেই প্রযুক্তি উদ্ভাবন হতে থাকবে এবং ব্যবহার চলবে।

চিত্র : ট্রাক্টর   চিত্র : চারো   চিত্র : দেশি লাঙল   চিত্র : পলো
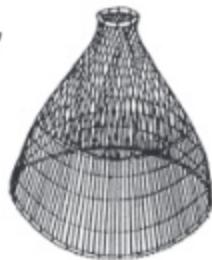
এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- কৃষি প্রযুক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সহজলভ্য কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য ও সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কৃষি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

কৃষি প্রযুক্তির ধারণা ও ব্যবহার

পাঠ- ১ কৃষি প্রযুক্তির ধারণা

পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা আরও বেশি হারে বাড়ছে। বাড়তি মানুষের জন্য বাড়তি খাবার দরকার। আবার অন্যান্য কৃষিপণ্যেরও বেশি দরকার। এই বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য সব সময় মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে আসছে। ফলে যুগে যুগে চাষাবাদের জন্য মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ভাবন করছে নতুন নতুন কৌশল বা প্রযুক্তি। তা হলে প্রযুক্তি কী? যখন মানুষ কৃষিকাজ শেখেনি তখন তারা পশু-পাখি শিকার করে মাংস খেত। বনজঙ্গল থেকে ফল-মূল কুড়িয়ে খেত। এক সময় তারা দেখল পশু-পাখি শিকার করে ও কুড়ানো ফল,মূলে তাদের ক্ষুধা মেটে না। তারা সমস্যায় পড়ে গেল। হঠাৎ তারা দেখল, মাটিতে বীজ পড়লে চারা বের হয়, গাছ বড় হয়, ফুল ও ফল হয়। আর এই ফল খাওয়া যায়। এভাবে তারা প্রথম প্রযুক্তি হিসেবে কৃষি উদ্ভাবন করল। অর্থাৎ তারা ফসল উৎপাদন শুরু করল। এরপর তারা বনের পশুদেরও পোষ মানিয়ে গৃহে পালনের কৌশল লাভ করল। এতে বোঝা গেল, ফসল উৎপাদন ও পশু পালন কৃষির আদি প্রযুক্তি।

আদি মানুষেরা ফসল উৎপাদন কীভাবে করত? এ জন্য আদি মানুষেরা চোখা কাঠি দিয়ে অল্প জায়গায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটি আলগা করে ফসল ফলাত। তখন এই চোখা কাঠিই ছিল জমি চাষের উপযুক্ত প্রযুক্তি। চোখা কাঠির অল্প জমি চাষে যে ফসল ফলে তাতে মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণ করতে পারতো না। প্রয়োজন হলো এমন এক প্রযুক্তি, যা দ্বারা অধিক জমি চাষ করা যায়। মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। চিন্তার ফসল হিসাবে উদ্ভাবন হলো কাঠের লাঙল, লোহার লাঙল, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি।

কৃষি সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও কলাকৌশলকে কৃষি প্রযুক্তি বলা হয়। কৃষি প্রযুক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো :

১. এর মধ্যে নতুনত্ব থাকবে ;
২. কৃষিকাজ সহজ করবে ;
৩. অধিক উৎপাদনের নিশ্চয়তা থাকবে ;
৪. খরচ কম কিন্তু লাভ বেশি হবে এবং
৫. সময় কম লাগবে।

কৃষি প্রযুক্তির বিষয়ভিত্তিক প্রকারভেদ

কৃষি এখন শুধু ফসল উৎপাদনের ব্যাপার নয়। শুধু পশু-পাখি পালনও নয়। কয়েকটি উৎপাদন ক্ষেত্র নিয়ে কৃষির বিকাশ ঘটেছে। তেমনি প্রত্যেকটি উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রযুক্তিও বিকাশ লাভ করেছে। ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি পালন, মৎস্য চাষ, বনায়ন-এসব বিষয় নিয়েই কৃষি। কৃষির উন্নয়ন অর্থই হচ্ছে এসব বিষয়ের

সঠিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সঠিক ব্যবহার। অতএব নিচের ছকে কৃষির বিষয়ভিত্তিক কলাকৌশল বা প্রযুক্তির পরিচয় দেওয়া হলো :

কৃষি বিষয়	প্রযুক্তি
ফসল উৎপাদন	বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত, লবণ সহনশীল জাত, গোবর সার, জীবাণু সার, রাসায়নিক সার, সার ব্যবহারের মাত্রা, কীটনাশক, কীটনাশক ব্যবহারের মাত্রা, সাথী ফসল, সবুজ সার, পাওয়ার টিলার, লোলিফট পাম্প, গভীর নলকূপ, সেঁউতি, দোন ইত্যাদি।
গৃহপালিত প্রাণী পালন	উন্নত জাতের গবাদি পশু, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি, গরু মোটাতাজাকরণ, কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ, একত্রে হাঁস-মাছ-ধান চাষ, হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্য, উন্নত পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদন, উন্নত পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ, পশু-পাখির রোগ দমন ইত্যাদি।
মৎস্য চাষ	খাঁচায় মাছ চাষ, মাছ ধরার বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমনঃ পলো, জাল, বড়শি, পুকুরের পানি শোধন, তেলাপিয়া ও নাইলোটিকার চাষ, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি।
বনায়ন	সামাজিক বনায়ন, কৃষিবনায়ন, বৃক্ষ ও মাঠ ফসল চাষ পদ্ধতি, বনজ ও ফলদ উদ্ভিদ চাষ পদ্ধতি, বৃক্ষ ও গো-খাদ্য চাষ পদ্ধতি, চারা উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি।

কাজ : বিষয়ভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তিগুলো পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : কৃষি প্রযুক্তি, ফসল উৎপাদন, গৃহপালিত প্রাণী পালন, জীবাণু সার, খাঁচায় মাছ চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, সামাজিক বনায়ন।

পাঠ- ২ : কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার

কৃষি প্রযুক্তি কৃষি কার্যক্রমকে অনেক সহজ করেছে। তাই কৃষি এখন লাভজনক পেশা। বর্তমানে কৃষকেরা দেশি লাঙলের পরিবর্তে কলের লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছেন। এতে কৃষকের অর্থ, সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হচ্ছে। খাদ্যঘাটতি বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা, উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ করে কৃষকেরা এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করছেন। এছাড়া কৃষির কর্মকাণ্ডের জন্যই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটেছে যেমনঃ জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জৈব সার, রাসায়নিক সার ও সবুজ সার ব্যবহার করা হচ্ছে। বীজ বপন, ফসল কাটা, ফসল মাড়াই-ঝাড়াই এর জন্য হস্ত ও শক্তি চালিত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে কৃষকেরা কৃষিকাজ অনেক সহজে করতে পারছেন।

কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক। কৃষির প্রতিটি ক্ষেত্রে আবহমানকাল ধরেই কৃষকেরা কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছেন। দিন দিন কৃষকদের সমস্যা জটিল হচ্ছে আর কৃষি প্রযুক্তিগুলোও আধুনিক হচ্ছে। যেমনঃ কৃষকেরা জমি চাষে দেশি লাঙল ব্যবহার করেন। কিন্তু ইদানীং বেশিরভাগ কৃষকই দেশি কাঠের লাঙলের পরিবর্তে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ব্যবহার করছেন। নিচে আরও কায়েকটি কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

চিত্র : বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ

১. বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ প্রযুক্তি : বসতবাড়ির চারপাশে সবাই বৃক্ষরোপণ করে। কিন্তু বসতবাড়ির কোন স্থানে কোন বৃক্ষটি রোপণ করা দরকার, তা অনেকেই জানেন না। বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণের জন্য কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। এসকল নিয়মাবলি মেনে বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ করলে বাড়িতে পর্যাপ্ত আলোবাতাস পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত জানতে পারব।

২. শূন্য চাষে ভুট্টা চাষ : জমি চাষ না করেও ভুট্টা চাষ করা যায়। বর্ষার পানি নেমে গেলে জমি কাদাময় থাকে। সেই জমিতে ভুট্টার বীজ রোপণ করলে ভালো ফলন হয়। এতে অর্থ আয় হয় এবং শ্রম কম লাগে।

চিত্র : মাটির হাঁড়িতে ডিম সংরক্ষণ

৩. মাটির হাঁড়িতে ডিম সংরক্ষণ : সাধারণত ডিম ৫-১০ দিনের বেশি ভালো থাকে না। ঘরের মেঝেতে গর্ত করে সেই গর্তে হাঁড়ি বসিয়ে ডিম রাখা হয়। গর্তে হাঁড়ির চারদিকে কাঠ কয়লা রেখে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে ডিম ঠান্ডা থাকে এবং ২০-২৫ দিন ডিম ভালো থাকে।

কাজ : 'বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই' এ সম্পর্কে দলগত আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : মাটির হাঁড়িতে ডিম সংরক্ষণ, শূন্য চাষে ভুট্টা চাষ, বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ

কৃষি যন্ত্রপাতির ধারণা ও ব্যবহার

পাঠ- ৩ : কৃষি যন্ত্রপাতির ধারণা

কৃষিকাজ একটি কারিগরি কাজ। কৃষির অধিকাংশ কাজই যন্ত্রের সাহায্যে করতে হয়। কৃষিকাজ একক কোনো কাজ নয়। এটা একটা প্রক্রিয়া, অনেকগুলো কাজের সমাহার। একটা কাজের সাথে আরেকটা কাজের ধারাবাহিকতা আছে। যেমনঃ জমি চাষ কৃষিকাজের শুরু আর ফসল মাড়াই-ঝাড়াই করে গোলাজাত করা কৃষিকাজের শেষ। জমি চাষ থেকে ফসল গোলাজাত পর্যন্ত সব কাজই যন্ত্রনির্ভর। কৃষিকাজ সম্পাদন করার জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তা-ই হচ্ছে কৃষি যন্ত্রপাতি।

বাংলাদেশের একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে জমির পরিমাণ কমে আসছে। অল্প জমি থেকে বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ জয়ের জন্য সঠিক যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার দরকার। শুধু ভালো বীজ, সার, পানি বা ঔষধ ব্যবহারই ফসল উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতিরও দরকার। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার যত সঠিক হবে, ফসল উৎপাদনও তত ভালো হবে।

জমিতে ফসল জন্মাতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুধু এখন নয়, প্রাচীন যুগেও ছিল। তখন কাঠের, হাড়ের বা পাথরের চোখা যন্ত্রের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে আগাছা পরিষ্কার করে ফসলের বীজ বপন হতো। এরপর ক্রমান্বয়ে মানুষ ফসল উৎপাদনের কাজে গরু, মহিষ, ঘোড়া ও যান্ত্রিকশক্তি ব্যবহার করতে লাগল। কৃষিকাজ ভেদে এবং ফসল ভেদে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন।

ফসল উৎপাদনের কৃষিকাজগুলো হলো : জমি চাষ, বীজ বপন, চারা রোপণ, সার প্রয়োগ, আগাছা দমন, পোকামাকড় ও রোগ দমন, পানিসেচ দেওয়া, ফসল তোলা, মাড়াই-ঝাড়াই করা, শুকানো ও গোলাজাত করা। প্রত্যেকটি কাজের সাথেই যন্ত্রের ব্যবহার আছে।

যেসব যন্ত্র দ্বারা জমি চাষ, বীজ বপন, আগাছা দমন, পোকামাকড় দমন, পানি সেচ দেওয়া, ফসল তোলা, মাড়াই-ঝাড়াই করা হয় সেগুলোই কৃষি যন্ত্রপাতি। কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোর কিছু হস্তচালিত, আর কিছু শক্তিচালিত।

কাজ : ১. তোমার এলাকায় যে কৃষিকাজ হয় তা লক্ষ কর এবং কাজগুলোর তালিকা তৈরি কর। অতঃপর তোমার পাঠে উল্লিখিত কাজগুলোর সাথে মিলাও।
২. কোন কাজের জন্য কোন যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়, তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : কৃষি যন্ত্রপাতি, হস্তচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি, শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি।

পাঠ- ৪ : হস্তচালিত উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার

হস্তচালিত কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোকে কালক্রমে উন্নত করা হয়। নিচে হস্তচালিত উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির কয়েকটির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

বারি লাঙল

পুরো জমি প্রস্তুত করার জন্য দেশি লাঙলের চেয়ে অর্ধেক সময়ের প্রয়োজন হয় এবং প্রথম চাষে কোনো জমি চাষ ছাড়া থাকে না। এর সুবিধা :

১। বারি লাঙল মাটি কেটে উল্টে দেয়;

২। চাষের গভীরতা ও প্রশস্ততা দেশি লাঙলের চেয়ে বেশি;

৩। শুকনা ও ভেজা উভয় প্রকার জমি চাষ করা যায়।

চিত্র : বারি লাঙল

মোল্ড বোর্ড লাঙল

মোল্ড বোর্ড লাঙল দেশি লাঙলের চেয়ে অধিকতর কার্যকর। এর সুবিধাঃ

১। এই লাঙলের সকল অংশই লোহার তৈরি;

২। এই লাঙল জমির মাটিকে আয়তাকার টুকরা করে চাষ করে এবং উল্টে দেয়।
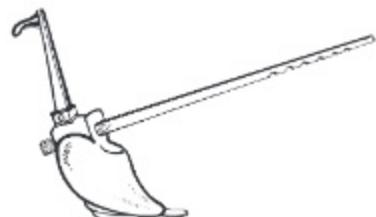
চিত্র : মোল্ড বোর্ড লাঙল

বারি বীজ বপন যন্ত্র

এটি একটি হাতে চালিত বীজ বপন যন্ত্র। এর সুবিধা :

১। বীজ ঠিক দূরত্বে ও গভীরতায় বপন করা যায়;

২। এর দ্বারা বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হয়; এবং

৩। বীজের পরিমাণ কম লাগে।

চিত্র : বারি বীজ বপন যন্ত্র

ঔষধ ছিটানো যন্ত্র : ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার

চিত্র : ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার

স্প্রেয়ার ফসলের রোগ ও পোকা দমনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এতে পানি মিশ্রিত ঔষধ ভর্তি করে ট্রিগারের সাহায্যে নির্দিষ্ট উচ্চতায় ছিটানো হয়। স্প্রেয়ারের প্রধান প্রধান অংশ হচ্ছে : (১) নজল (২) ট্রিগার (৩) পাম্প করার বাল্ব (৪) ব্যারেল (৫) ঔষধ ছিটানোর নল।

প্যাডেল থ্রেসার

চিত্র : প্যাডেল থ্রেসার

এটি একটি উন্নত হস্তচালিত ধান বা গম মাড়াই যন্ত্র। এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে : টাইনযুক্ত একটি ড্রাম, ড্রামের সাথে যুক্ত একটি প্যাডেল। প্যাডেলের সাহায্যে ড্রামটিতে ঘূর্ণন সৃষ্টি করা হয় এবং যাতে ফসলের শীষ রাখলে টাইনের আঘাতে শস্য মাড়াই হয়। এটি ধান বা গম মাড়াইয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি করা হয়।

বারি পাম্প

চিত্র : বারি পাম্প

বারি পাম্প একটি লোলিফট পাম্প। স্থানীয়ভাবে তৈরি করা যায়। এটি একটি আধুনিক সেচ প্রযুক্তি। এর সুবিধা:

১। অনেক বেশি পানি উঠানো যায়;
২। এটা দিয়ে মাটির নিচ এবং উপর থেকে পানি উঠানো যায়;

কাজ : তোমার গ্রামের বাড়িতে যাও। দেখ হস্তচালিত উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো কৃষকেরা ব্যবহার করছেন কি না। যদি করেন, তবে এগুলো ব্যবহারের সুবিধাগুলো তোমার খাতায় লেখ।

নতুন শব্দ : বারি লাঙল, মোল্ড বোর্ড লাঙল, বারি বীজ বপন যন্ত্র, প্যাডেল থ্রেসার ।

পাঠ- ৫ : শক্তিচালিত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার

কৃষিকাজকে আরও সহজ করার জন্য শক্তিচালিত নানান কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। নিচে কয়েকটি যন্ত্রপাতির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

পাওয়ার টিলার

এর উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ঘূর্ণি লাঙল। চাষের সময় লাঙলটি প্রচণ্ড গতিতে ঘোরে। আর তাতে গভীরভাবে জমি চাষ হয়। এতে মাটি ঝুরঝুরে হয় ও আগাছা ধ্বংস হয়। ঘূর্ণি লাঙল চালাতে সুবিধা হলো, এর সাথে চাকতি বা ফালি লাঙল ও রোটারি লাঙল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। পাওয়ার টিলার দ্বারা দ্রুত ও গভীরভাবে জমি চাষ করা হয়।
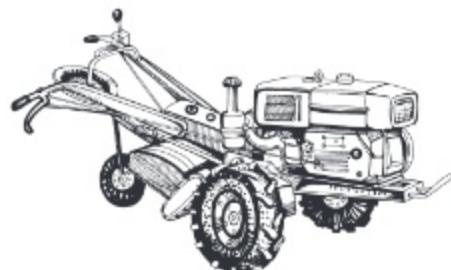
চিত্র : পাওয়ার টিলার

বারি শস্য ঝাড়াই যন্ত্র

স্থানীয়ভাবে এটি তৈরি করা যায়। বারি শস্য ঝাড়াই যন্ত্র ব্যবহারে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো পাওয়া যায় :

১। ঘরের ভিতর খারাপ আবহাওয়ায় ব্যবহার করা যায়;
২। অল্প সময়ে ও অল্প খরচে ঝাড়াই ও পরিষ্কার করা যায়;
৩। এটা চালানো সহজ।
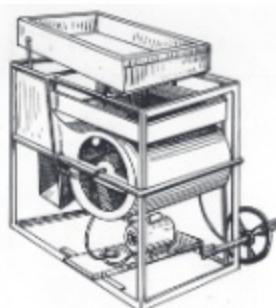
চিত্র : বারি শস্য ঝাড়াই যন্ত্র

সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প

এটি শক্তিচালিত সেচযন্ত্র। এর সাহায্যে লোলিফট পাম্প, অগভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপ চালানো হয়। লোলিফট পাম্প দ্বারা নদী বা খাল-বিল হতে আর অগভীর বা গভীর নলকূপ দ্বারা মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন করে ফসলের মাঠে সেচ দেওয়া হয়।
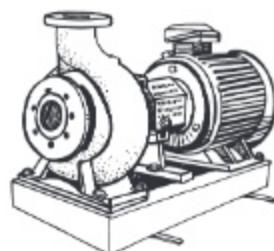
চিত্র : সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প

সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের সুবিধা

১। সহজে পানি তুলে সেচ দেওয়া যায়;
২। অশ্বশক্তির মাত্রায় পানি উঠে;
৩। প্রয়োজন অনুযায়ী চালানো যায়।

বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র

চিত্র : বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র

বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র একটি আধুনিক মাড়াই প্রযুক্তি। এর দ্বারা বিভিন্ন রকমের ফসল মাড়াই করা যায়।এর ক্ষমতা প্যাডেল থ্রেসারের চেয়ে বেশি। এর সুবিধা-

১। বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র দিয়ে ধান, গম ও ডাল মাড়াই করা যায় ;
২। কম আর্দ্রতার ফসল হলে যন্ত্রটি ভালো কাজ করে।

কাজ : কৃষকেরা যেসব শক্তিচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, এর একটা তালিকা তৈরি কর। কোন কোন যন্ত্রপাতির নাম এই পাঠে উল্লেখ করা হয়নি তা লেখ।

নতুন শব্দ : পাওয়ার টিলার, বারি শস্য ঝাড়াই যন্ত্র, বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প।

সহজলভ্য কৃষি প্রযুক্তি

পাঠ- ৬ ভালো বীজ বাছাইকরণ

ভালো বীজে ভালো ফসল অর্থাৎ গুণগত মানসম্পন্ন বীজ থেকেই ভালো ফসল জন্মায়। প্রবাদ আছে যে
'সুবংশে সুসন্তান সুধীজনে কয়
ভালো বীজে ভালো ফসল জানিবে নিশ্চয়।'
ফসল উৎপাদনে ভালো বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক সময় ভালো বা উন্নত জাতের বীজ হলেও নানা কারণে বীজ ভালো হয় না। বীজে অনেক কিছু থাকতে পারে, যা উন্নত জাতের বীজকেও নির্গুণ করে দেয়।

ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য

১। অন্য জাতের মিশ্রণমুক্ত থাকতে হবে।
২। বীজ পরিষ্কার ও পুষ্ট হবে।
৩। বীজের রং স্বাভাবিক হবে।
৪। বীজ দাগযুক্ত বা পোকা খাওয়া বা ভাঙা হবে না।
৫। ইট, পাথরের কণা ও আগাছা থেকে বীজ মুক্ত হবে।
৬। বীজ অঙ্কুরোদ্গমের শতকরা হার কম পক্ষে ৮০ ভাগ হবে।

ভালো বীজ পেতে হলে নীরোগ ও পোকামুক্ত জমি হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ভালো করে ফসল কাটার পর পরিচ্ছন্নভাবে মাড়াই-ঝাড়াই করে বীজকে অন্যজাতের বীজ, ইট-পাথরকণা, আগাছার বীজ, চিটা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করতে হবে। তারপরও বীজে ভেজাল থাকতে পারে। তাই বীজ বাছাই করা একান্ত প্রয়োজন।

বীজ বাছাইকরণ পদ্ধতি

নিম্নলিখিতভাবে বীজ বাছাই করা যায়

ক) বীজ বাছাইয়ের উপকরণ নির্বাচন

১. ১টি চিমটা, ১টি আতশ কাচ, ১ তা সাদা কাগজ ও ১টি ছোট নিক্তি

২. নির্দিষ্ট ফসলের বীজ

খ) বীজের পরিমাণ

১. ছোট বীজ ১০ গ্রাম

২. মাঝারি বীজ ৫০ গ্রাম

৩. ধান বা গম আকারের বীজ ১০০ গ্রাম

গ) কাজের ধাপ

১. ১০০ গ্রাম ধানের বীজ গুণে নাও ।

২. সাদা কাগজে ধানের বীজগুলো রাখ ।

৩. বীজগুলো হতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলো অপসারণ কর

- অন্য জাতের বীজ
- ভাঙা বা পোকা খাওয়া বীজ
- অপুষ্ট বীজ
- আগাছার বীজ
- জড় পদার্থ

৪. এখন বাছাইকৃত বীজ ও অপসারিত বস্তু আলাদাভাবে ওজন কর এবং বাছাইকৃত বীজের শতকরা হার বের কর ।

৫. সূত্র : $\text{বাছাইকৃত বীজের শতকরা হার} = \dfrac{\text{মোট বীজের ওজন - অপসারিত বস্তুর ওজন}}{\text{মোট বীজের ওজন}} \times ১০০$

বাছাইকৃত বীজের শতকরা হার যত বেশি হবে বীজ তত ভালো হবে, অর্থাৎ বীজ তত বিশুদ্ধ হবে । এভাবে আমরা বীজের বিশুদ্ধতার হার নির্ণয় করে ভালো বীজ চিনতে পারি ।

নতুন শব্দ : বীজ বাছাইকরণ, বীজের আর্দ্রতা, বীজ বাছাই উপকরণ

পাঠ- ৭ : কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ

শুকনা মৌসুমে গো-খাদ্যের অভাব ঘটে । তাই বর্ষাকালে যখন ঘাস প্রচুর জন্মে, তখনই শুকনা মৌসুমের জন্য গো-খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয় । এ জন্য কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় । কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতিকে সাইলেজ বলা হয় । এতে ঘাসের পুষ্টিমানের কোনো পরিবর্তন হয় না । যে নির্দিষ্ট স্থানে বা গর্তে ঘাস সংরক্ষণ করা হয়, তাকে বলা হয় সাইলোপিট । সাইলোপিটে বায়ুরোধক অবস্থা তৈরি করতে হয় । বায়ুরোধক অবস্থায় ঘাসে ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয় । এই ল্যাকটিক এসিড কাঁচা ঘাস সংরক্ষণে কাজ করে ।

কাঁচা ঘাসের গুরুত্ব অনেক । শীতকালে অনেক স্থানেই ঘাসের অভাব দেখা দেয় । তখন পশুকে মানসম্মত খাবার প্রদান কষ্টকর হয় । তাই বর্ষাকালে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব পূরণ করা যায় । সাইলেজের গুণাগুণ কাঁচা ঘাসের মতো । কাঁচা ঘাসের গুণসম্পন্ন সাইলেজে গবাদি পশুর দুধ উৎপাদন বাড়ে ।

যেসব ঘাসে কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে, সেসব ঘাস সাইলেজের জন্য ভালো। কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ বা সাইলেজের জন্য উন্নত জাতের কাঁচা ঘাস যেমনঃ প্যারা, নেপিয়ার, জার্মান, গিনি, ভুট্টা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তবে ভুট্টার সাইলেজ অনেক ভালো। কাঁচা ধানের খড় ও কাঁচা ঘাস ১:৫ অনুপাতে মিশিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যেতে পারে।

সাইলোপিট তৈরির স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন স্থানে সাইলোপিট তৈরি করতে হবে, যেখানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে না এবং ঘাসের অভাব হয় না। সাইলোপিট কাঁচা-পাকা দুই-ই হতে পারে। নিচে কাঁচা পিটে সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

১. কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের জন্য প্রথমেই শুকনা ও উঁচু জায়গা নির্ধারণ করতে হবে।
২. নির্ধারিত স্থানে ১ মিটার গভীর, ১ মিটার প্রস্থ এবং ১ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি গর্ত তৈরি করতে হবে।
৩. ১ ঘন মিটার একটি গর্তে প্রায় ৭০০ কেজি কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।
৪. কাঁচা ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে।
৫. এরপর চিটাগুড়ের সাথে সমপরিমাণ পানি মিশাতে হবে।
৬. গর্তের তলায় পলিথিন বিছালে ভালো হয়। পলিথিন না বিছালে পুরু করে খড় বিছাতে হবে এবং চারপাশে ঘাস সাজানোর সাথে সাথে খড়ের আস্তরণ দিতে হবে।
৭. এরপর ধাপে ধাপে ৭০০ কেজি কাঁচা ঘাস দিয়ে ২০-৩০ কেজি শুকনা খড় দিতে হবে।
৮. প্রতিটি ঘাসের ধাপে ১৫ থেকে ২০ কেজি চিটাগুড়-পানির মিশ্রণ সমভাবে ছিটাতে হবে।
৯. এভাবে ধাপে ধাপে ঘাস ও খড় বিছিয়ে ভালোভাবে পা দিয়ে পাড়াতে হবে, যাতে বাতাস বেরিয়ে যায়।
১০. ঘাস সাজানো শেষ হলে খড়ের আস্তরণ দিয়ে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
১১. সর্বশেষে পলিথিনের উপর ৭.৫ - ১০ সেমি মাটি পুরু করে দিতে হবে।

আকালের সময় (অক্টোবর-নভেম্বর) সংরক্ষিত কাঁচা ঘাস বা সাইলেজ গরুকে খেতে দিতে হবে। পিটের একদিক থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে ঘাস বের করতে হবে। এর স্বাদ ও গন্ধ ভালো হওয়ায় গবাদি পশুরা এভাবে সংরক্ষিত কাঁচা ঘাস খেতে খুবই পছন্দ করে।

কাজ : উল্লিখিত বর্ণনা মোতাবেক কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের জন্য তোমরা দলবদ্ধ হয়ে ৫০ সে মি গভীর, ৫০ সে মি প্রস্থ এবং ৫০ সে মি দৈর্ঘ্যের একটি গর্ত তৈরি কর। গর্তে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ কর।

নতুন শব্দ : সাইলেজ, কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ, সাইলোপিট, চিটাগুড়, কার্বোহাইড্রেট, নেপিয়ার, প্যারা, গিনি।

পাঠ- ৮ : খাঁচায় মাছ চাষ

দেশের জনসংখ্যা বাড়ার কারণে মাছের চাহিদাও অনেক বেড়েছে। বিভিন্ন কারণে বাজারে মাছের সরবরাহ কমে যাচ্ছে। মাছের চাহিদা পুরণের জন্য মৎস্য বিশেষজ্ঞরা মুল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অনেক পরামর্শের মধ্যে খাঁচায় মাছের চাষ একটি। বর্তমানে মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। খাঁচায় মাছের চাষ আমাদের দেশে নতুন হলেও উত্তর আমেরিকায় অনেক আগে থেকেই এর ব্যবহার চলে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশেও এর প্রচলন আছে।

বাংলাদেশে খাঁচায় মাছ চাষ মৎস্য বিশেষজ্ঞদের একটি অনুমোদিত প্রযুক্তি। যেসব এলাকায় নদী-নালা, হাওর, খাল-বিল আছে সেসব এলাকার কৃষকেরা এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে পারেন। নদীতে বা বিলে বা যে কোনো উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচা বানিয়ে পুকুরের আকার দেওয়া যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, খাঁচায় মাছের চাষ করে একদিকে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানো যায়, অপরদিকে এই মাছ বাজারে বিক্রি করে অর্থ লাভ করা যায়।

খাঁচা তৈরির প্রথমেই চারদিকে চারটি খুঁটি দিয়ে এবং আড়াআড়ি বাঁশ বেঁধে খাঁচার আয়তাকার কাঠামো তৈরি করা হয়। এরপর খাঁচার কাঠামোর চারদিকে এবং উপরে-নিচে জাল দ্বারা আবৃত করে খাঁচা তৈরি করা হয়। পরে খাঁচাটি তুলে নদীতে বা হাওরে নিয়ে মাটিতে শক্ত করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে এর সাথে বেঁধে দিতে হয়। খাঁচার উপরের দিকে মাছের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়। খাঁচা ছোট, মাঝারি ও বড় হতে পারে। ছোট আকারের খাঁচার মাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্য ৩ মিটার, প্রস্থ ২ মিটার এবং গভীরতা ২ মিটার। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মাছ চাষের জন্য খাঁচার আকার এর চেয়েও দ্বিগুণ বা তিনগুণ আকারের হতে পারে। মাছের খাঁচা যে শুধু আয়তাকার হবে তা নয়। আবার গোলাকারও হতে পারে।

চিত্র : খাঁচায় মাছ চাষ

লম্বা বাঁশের ফ্রেম বানিয়ে এর সাথে ঘন ছিদ্রযুক্ত নেট বা জাল লাগিয়ে অনেকগুলো খোপের মাছের খাঁচা তৈরি করা যায়। বিভিন্ন খোপে বিভিন্ন মাছের চাষ করা যেতে পারে।

স্রোতহীন বা কম স্রোতের পানিতে খাঁচা বসাতে হবে। বেশি স্রোতে খাঁচার ব্যবস্থাপনা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। খাঁচা খুঁটি বা প্লাটফর্ম দ্বারা বসাতে হবে। খুঁটির চেয়ে প্লাটফর্ম বেশি ভালো। তেলের ড্রাম দ্বারা প্লাটফর্ম তৈরি করা যায়। প্লাটফর্ম ব্যবহার করলে যেকোনো গভীরতায় খাঁচা বসানো যায়।

খাঁচায় মাছের চাষ হলো নিবিড় চাষ। এ জন্য সুষম খাদ্য অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে খাঁচায় তেলাপিয়া, নাইলোটিকা ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ করা যায়। খাঁচা বড় হলে পাঙ্গাস মাছও চাষ করা যায়। তবে এদের মাঝে তেলাপিয়ার চাষ লাভজনক। তেলাপিয়া চাষ করতে হলে প্রতি ১ ঘনমিটার খাঁচায় ২০০-৩০০ পোনা ছাড়তে হবে। গমের ভুসি ও ফিশমিল যথাক্রমে ৮৫% ও ১৫% হারে মিশিয়ে মাছকে খাদ্য হিসাবে দিতে হবে। প্রতিদিন খাদ্যের পরিমাণ থাকবে মাছের দেহের ওজনের ৬-৭%। খাঁচার তলার সবটুকু অংশ পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে তাতে খাদ্য দিতে হবে।

খাঁচার জাল পলি ও শেওলায় ভর্তি হয়ে যেতে পারে। এমন হলে যথাসময়ে ব্রাশ বা বাঁশের শলার ঝাঁটা দিয়ে জাল পরিষ্কার করতে হবে। প্রতি ৩ মাস অন্তর একটি ১ ঘন মিটার খাঁচা হতে ২০ কেজি তেলাপিয়া উৎপাদন করা সম্ভব।

নতুন শব্দ : খাঁচায় মাছ চাষ, মৎস্য বিশেষজ্ঞ, প্লাটফর্ম, ফিশমিল।
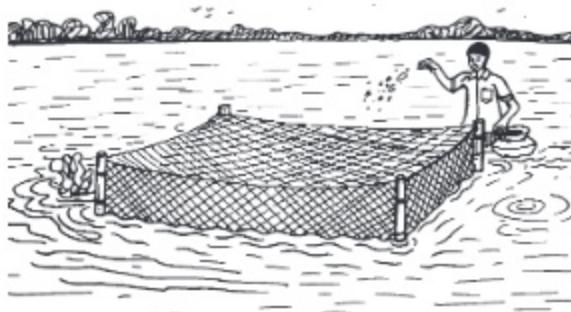
স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতির ধারণা ও ব্যবহার

স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি সবার কাছেই পরিচিত। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতেই এই স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো দেখা যায়। স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে জমি চাষের যন্ত্রপাতি যেমনঃ দেশি লাঙল, জোয়াল, মই ও কোদাল প্রধান। পশুপালন যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে মুরগির খাবার পাত্র ও পানির পাত্র প্রধান। আবার মাছ ধরার যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে পলো, বড়শি ও জাল প্রধান।

পাঠ- ৯ : ফসল উৎপাদনের স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার

ফসল উৎপাদনের জন্য স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে লাঙ্গল, জোয়াল, মই ও কোদাল প্রধান। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

লাঙল : লাঙল দেশি লাঙল হিসাবেই অধিক পরিচিত। একটি কাঠকে বাঁকা করে কাঠের আগায় লোহার একটি ফলক বা ফাল লাগানো হয়। এই ফলকের সাহায্যেই লাঙল মাটি চিরে জমি চষে। লাঙলের উপরের অংশকে বলা হয় হাতল। এই হাতল চেপে ধরেই কৃষকেরা জমিতে লাঙল চালনা করেন।

লাঙলের মধ্যস্থানে একটি ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্রপথে প্রায় ৮ ফুট লম্বা একটি কাঠ যুক্ত করা হয়, যার আগায় ৪-৫টি দাঁত বা খাঁজ কাটা থাকে। এটাকে ঈশ বলা হয়। ঈশের খাঁজে রশি বেঁধে জোয়ালের সাথে লাঙল লাগানো হয়। ঈশ যাতে লাঙলের সাথে ভালোভাবে আবদ্ধ থাকে সেজন্য ছোট কাঠের একটি খিল ব্যবহার করা হয়।

লাঙল ব্যবহারের সুবিধা

১। লাঙল সহজলভ্য;
২। লাঙল তৈরি করা ও পরিচালনা সহজ;
৩। লাঙল ওজনে হালকা বলে বহন করা সহজ।
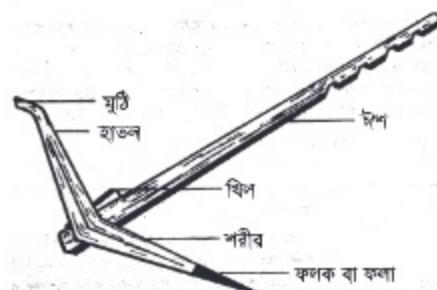
চিত্র: দেশি লাঙল

জোয়াল : জোয়াল হালের গরুর কাঁধে স্থাপন করে লাঙলের সাথে যুক্ত করা হয়। জোয়ালের দুই প্রান্তে দুটি ছিদ্র করা হয়। ছিদ্রপথে ছিদ্রের মাপ অনুযায়ী দুটি শক্ত কাঠি লাগানো হয়। জোয়াল গরুর কাঁধে রেখে কাঠি দুটির সাথে রশি বেঁধে লাঙলের সাথে জোড়া হয়।

জোয়ালের সুবিধা

১। বাঁশ বা কাঠ দিয়ে জোয়াল তৈরি করা যায়;
২। জোয়াল তৈরি করা সহজ;
৩। ওজনে হালকা।
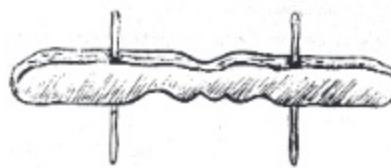
চিত্র : জোয়াল

মই : মই প্রধানত বাঁশ বা কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়। মোটা একটি বাঁশকে লম্বালম্বি ফালি করে দুই ভাগ করা হয়। অনেক মইয়ে তিনটি ফালি ব্যবহার করা হয়। এক জোড়া গরু হলে লম্বা হবে ৫ ফুট এবং দুই জোড়া গরু হলে লম্বা হবে সাড়ে সাত ফুট। মইয়ের কাজ হলো :
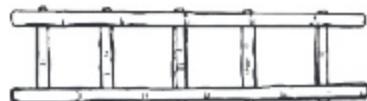
চিত্র : মই

১। মাটির ঢেলা ভাঙা;
২। মাটি সমতল করা;
৩। আগাছা দমন ও আলাদা করা;
৪। বীজের অঙ্কুরোদগম সহজ করা।

কোদাল : কোদাল কৃষিকাজের একটি অতিপরিচিত যন্ত্র। জমির কোনা বা আইল ঘেঁষা ভূমি যেখানে লাঙলের ফলা স্পর্শ করে না তা কোদাল দিয়ে চাষ করা হয়। এছাড়া ছোট ছোট প্লটে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সবজি চাষ করা হয়। কোদাল দ্বারা গর্ত করে ফলের চারা লাগানো হয়। কোদাল লোহার পাত দ্বারা তৈরি। লোহার পাত মুখের দিকে ২০ সেমি প্রস্থ হয় এবং ২৮ সেমি লম্বা হয়। প্রায় তিন ফুট লম্বা কাঠের হাতল লাগানো হয়।

কোদালের সুবিধা :

১। স্থানীয়ভাবে কামারশালায় তৈরি করা যায় ;
২। মাটি আলগা করা, ঢেলা ভাঙ্গা ও আগাছা দমনেও কোদাল ব্যবহার করা যায়।

চিত্র : কোদাল

আঁচড়া বা বিদা : আঁচড়া বা বিদা কাঠ ও বাঁশ বা লোহার খিল দিয়ে তৈরি করা হয়। আঁচড়ার ১.৫ মি. লম্বা একটি দণ্ড থাকে। এই দণ্ডে ১০ সেমি পরপর ছিদ্র থাকে। ছিদ্রপথে বাঁশের বা লোহার খিল লাগানো হয়। এতে হাতল ও ঈশ লাগানো হয়। আঁচড়ার প্রধান কাজ হলো :

১। ফসল পাতলা করা;
২। আগাছা দমন করা;
৩। মাটি আলগা করা।
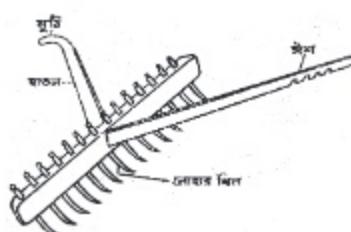
চিত্র : আঁচড়া বা বিদা

নিড়ানি : ফসলের জমি হতে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি আলগা করার কাজে নিড়ানি ব্যবহার করা হয়। এর আগার দিক অর্ধ-চন্দ্র আকৃতির লোহার পাত দিয়ে তৈরি করা হয়। আর গোড়ার দিকে সরু হয় এবং কাঠের বাঁট লাগানো হয়।
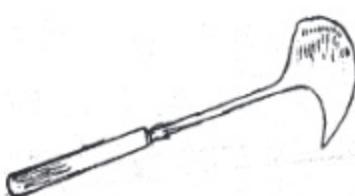
চিত্র : নিড়ানি

কাজ : তোমাদের বাড়িতে যেসব কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় এর তালিকা তৈরি কর। তৈরি তালিকার সাথে এই পাঠে উল্লিখিত যন্ত্রগুলোর নাম মিলাও।

নতুন শব্দ : লাঙল, জোয়াল, আঁচড়া, নিড়ানি, ঈশ।

পাঠ- ১০ : মাছ ধরার স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার

স্থানীয়ভাবে মাছ ধরার অনেক যন্ত্রপাতি আছে। তন্মধ্যে জাল, পলো ও বড়শি প্রধান। প্রায় কৃষকের ঘরেই বিভিন্ন রকম জাল, পলো, বড়শি দেখতে পাওয়া যায়।

১। জাল : জাল এদেশের প্রাচীন মাছ ধরার কৌশল। জাল সুতা দ্বারা তৈরি করা হয়। পুকুর, ডোবা, নদী-নালা, খাল-বিল, এমনকি সমুদ্র থেকেও জাল দ্বারা মাছ ধরা হয়। পানিতে জাল পাতলে বা জাল ফেললে জালের ফাঁসে মাছ আটকা পড়ে। কৃষকেরা বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করেন। যেমনঃ ঝাঁকি জাল, ঠেলা জাল এবং খরা জাল।

ক) ঝাঁকি জাল : ঝাঁকি জালের উপরের প্রান্তে সরু রশি বাঁধা থাকে। জালের নিচের দিকে লোহার ছোট ছোট কাঠি যুক্ত করা হয়, যাতে পানিতে জাল ফেললে তাড়াতাড়ি ডুবে যেতে পারে। মাছ ধরার সময় খাল, পুকুর বা নদীর তীর থেকে রশিটি হাতে রেখে জাল পানিতে ছুড়ে মারা হয়। পরে রশি ধরে টেনে জাল তোলা হয়। জালের নিচে অনেক ধরনের মাছ আটকা পড়ে। পুঁটি, চিংড়ি, কার্প ও নলা মাছ বেশি ধরা পড়ে।

চিত্র : ঝাঁকি জাল

খ) ঠেলা জাল : ঠেলা জাল তিন কোনা। এটাকে তিন কোনা বাঁশের ফ্রেমে আটকানো হয়। ঠেলা জাল দিয়ে সাধারণত ছোট ছোট মাছ ধরা হয়। ঠেলা জালের হাতল ধরে পানিতে নেমে সামনের দিকে নিলে এই জালে পুঁটি, খলিসা, চিংড়ি, বেলে ইত্যাদি মাছ ধরা পড়ে।

চিত্র : ঠেলা জাল

গ) খরা জাল : এটি একটি ত্রিভুজাকৃতির জাল যা বাঁশের মাচা বা টং থেকে চালানো হয়। জাল ইংরেজী "V" আকৃতির বাঁশের কাঠামোর মাঝখানে বাঁধা থাকে। জালটি নদী বা বিলে মাছের চলাচলের পথে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর জালের পিছনের দিকে বাঁশের গোড়ায় চাপ দিলে জাল উপরে উঠে আসে। এর পর জালে আটকা পড়া মাছ সংগ্রহ করা হয়।
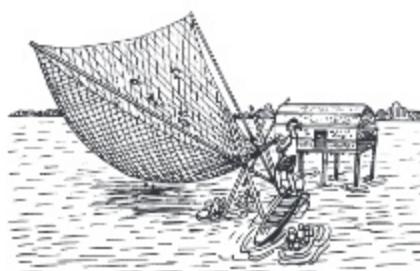
চিত্র : খরা জাল

২। **পলো :** পলো মাছ ধরার একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এটি বাঁশের শলাকা ও বেত দিয়ে তৈরি। এর নিচের দিকের মুখ গোলাকার ও বড় এবং উপরের দিকের মুখও গোলাকার কিন্তু ছোট। দুই মুখই খোলা থাকে।

পলো উপরের দিকে হাত দিয়ে ধরে অগভীর পানিতে চাপ দিতে হয়। মাছ পলোতে আটকা পড়লে পলোর ভিতরে ছুটাছুটি করতে থাকে। অতঃপর উপরের মুখ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে পলোর ভিতর থেকে মাছ ধরা হয়। শোল, গজার ইত্যাদি বড় মাছ পলোতে ধরা পড়ে।

চিত্র : পলো

৩। **বড়শি :** বড়শি লোহার তৈরি। বড়শির জন্য প্রায় ২০০ সেমি লম্বা একটি ছিপ দরকার পড়ে। হাটে-বাজারে এমনকি শহরেও মাছ ধরার জন্য বিশেষ ধরনের ছিপ পাওয়া যায়। ছিপের আগায় সুতার এক প্রান্ত বেঁধে অপর প্রান্ত বড়শির সাথে বাঁধা হয়।

চিত্র : বড়শি

বড়শিতে বিভিন্ন ধরনের টোপ লাগিয়ে পানিতে ফেলা হয়। মাছ টোপ দেখে খাওয়ার সময় বড়শিতে আটকা পড়ে। তারপর সুতাটি টেনে বড়শি থেকে মাছ সংগ্রহ করা হয়। বড়শি অনেক প্রকারের। ছোট পুঁটি মাছ থেকে শুরু করে বৃহৎ বোয়াল মাছও বড়শিতে আটকা পড়ে।

কাজ : তোমার এলাকাবাসী কী কী যন্ত্র দ্বারা মাছ ধরেন এর একটা তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : ঝাঁকি জাল, ঠেলা জাল, খরা জাল, পলো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কৃষি যন্ত্রপাতি...............প্রকার।

২. পাওয়ার টিলার দ্বারা.......ও .... জমি চাষ করা হয়।

৩. পলো ....ধরার একটি প্রাচীন পদ্ধতি।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. লাঙল	ডিম সংরক্ষণ।
২. আগাছা	জাল।
৩. প্যাডেল থ্রেসার	নিড়ানি।
৪. মাছ	জমি চাষ।
৫. মাটির হাঁড়ি	মাড়াই যন্ত্র।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কৃষি প্রযুক্তি কাকে বলে?

২. পাঁচটি কৃষি যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

৩. লাঙল ব্যবহারের সুবিধা লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জমি চাষের জন্য লাঙলের যে ধারাবাহিক পরিবর্তন এসেছে তা বর্ণনা কর।

২. খাঁচায় মাছ চাষ একটি কৃষি প্রযুক্তি-কথাটি ব্যাখ্যা কর।

৩. কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি ফসল মাড়াই যন্ত্র?

ক. পাওয়ার টিলার খ. প্যাডেল থ্রেসার
গ. ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ঘ. সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প

২. ভালো বীজে গজানোর হার কমপক্ষে শতকরা কত ভাগ?

ক. ৫০ ভাগ খ. ৬০ ভাগ
গ. ৭০ ভাগ ঘ. ৮০ ভাগ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মমতাজ মিয়া তার দুগ্ধ খামারে সবুজ ঘাসের অভাব মিটানোর জন্য প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে সাইলেজ প্রস্তুত করে রাখলেন।

৩. মমতাজ মিয়া কোন ঋতুতে সাইলেজ প্রস্তুত করে রাখলেন ?

ক. বর্ষাকাল খ. শরৎকাল
গ. হেমন্তকাল ঘ. শীতকাল

৪. সাইলেজ প্রস্তুতের ফলে মমতাজ মিয়ার খামারে-

i. সারা বছর সুষম খাদ্য সরবরাহ হবে
ii. কাঁচা ঘাসের অপচয় রোধ হবে
iii. খামারের খরচ কমে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. ফসলের পোকামাকড় দমনের জন্য ব্যবহৃত কৃষি উপকরণ কোনটি?

ক. নিড়ানি খ. আঁচড়া
গ. ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ঘ. বারিপাম্প

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কাশিমপুর গ্রাম একটি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর গ্রাম। এখানকার কৃষকরা কৃষিকাজে যন্ত্রনির্ভর। তাদের ফসলের ফলন পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। কৃষি কর্মকর্তা রাসেল সাহেব পার্শ্ববর্তী হরিপুর গ্রামের কৃষকদের কাশিমপুর গ্রামের মতো আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি হরিপুরের কৃষকদেরকে উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান করেন এবং কাশিমপুর গ্রামের কৃষকদের কার্যক্রম সরেজমিনে দেখাতে নিয়ে যান।

ক. কৃষি প্রযুক্তি কাকে বলে?
খ. আধুনিক প্রযুক্তি কৃষি ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় রোধ করে। ব্যাখ্যা কর।
গ. কাশিমপুর গ্রামের কৃষকদের বেশি ফলন লাভের কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. হরিপুর গ্রামের কৃষকদের জন্য রাসেল সাহেবের উদ্যোগটির মূল্যায়ন কর।

২. সচেতন কৃষক রফিক সাহেব ফসল উৎপাদনের জন্য সবসময়ই ভালো গুণসম্পন্ন বাছাইকৃত বীজ ব্যবহার করেন। এ বছর গম চাষের জন্য তিনি কিছু বীজ ক্রয় করেন। বীজগুলো থেকে ১০০ গ্রাম বীজ নিয়ে বাছাই করে তিনি নিম্নের বস্তুগুলো পান :

- অন্য জাতের বীজ- ৫ গ্রাম।
- ভাঙা ও পোকাখাওয়া বীজ- ৬ গ্রাম।
- অপুষ্ট বীজ- ৩ গ্রাম।
- আগাছার বীজ - ১ গ্রাম।
- জড় পদার্থ- ১ গ্রাম।

ক. ভালো বীজের রং কেমন হবে?

খ. বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ উন্নত জাতের বীজকে নির্গুণ করে দেয়। ব্যাখ্যা কর।

গ. রফিক সাহেব কর্তৃক বাছাইকৃত বীজের শতকরা হার বের কর।

ঘ. অধিক ফসল উৎপাদনে রফিক সাহেবের কাজটি মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি উপকরণ

ফসল উৎপাদনে কৃষি উপকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি উপকরণগুলোর মধ্যে মাটি, পানি, বীজ, সার উল্লেখযোগ্য। কোন মাটিতে কোন ফসল জন্মাবে, ভালো বীজের বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন, ফসলে সেচের দরকার আছে কি না, অতিরিক্ত পানি ফসলের ক্ষতি করছে কি না, জমিতে কী কী সার প্রয়োগ করা দরকার, এসব সম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ে বিস্তারিত জানব।

চিত্র : দোআঁশ মাটি
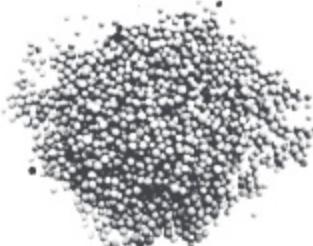
চিত্র : সরিষা বীজ

চিত্র : টিএসপি সার

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ব্যবহার অনুযায়ী উপযুক্ত মাটি শনাক্ত করতে পারব।
- কৃষি ফলনে মাটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি ক্ষেত্রে পানির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বীজের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- সারের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- কৃষিতে রাসায়নিক সারের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব।
- কৃষিকাজে সার ব্যবহারের উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।
- কৃষিকাজে পানির পরিমিত ব্যবহারে সচেতন হব।
- রাসায়নিক সার অতিরিক্ত ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

পাঠ-১ : মাটির গঠন

মাটি একটি প্রাকৃতিক বস্তু এবং মিশ্র পদার্থ। এ মাটিতে চাষাবাদ করে মানুষ শস্য ফলায়। আমরা কি জানি, এ মাটি কীভাবে তৈরি হয়েছে? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবী প্রথমে একটি জলন্ত অগ্নিগোলকের পিণ্ড ছিল। দীর্ঘকাল তাপ বিকিরণ করতে করতে এ পিণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে শিলাময় শক্ত ভূ-ত্বক সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় শিলা কালক্রমে ক্ষয় হয়ে মাটির সৃষ্টি হয়েছে।

পরিশেষে বলতে পারি, মাটি হলো: (১) প্রাকৃতিক বস্তু, যা খনিজ ও জৈব পদার্থের সমন্বয়ে ঘটিত; (২) ভূ-পৃষ্ঠের সবচেয়ে উপরের স্তর, যা উদ্ভিদকে অবলম্বন দেয়; (৩) বিভিন্ন পুরুত্ববিশিষ্ট নানা স্তর দ্বারা গঠিত যার প্রতিটি স্তরের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ধর্ম বিভিন্ন।

চিত্র : মাটির গঠন

মাটির গঠন উপাদান : মাটি প্রধানত ৪টি উপাদান দ্বারা গঠিত। উপাদানগুলো হলো– (১) অজৈব পদার্থ বা খনিজ পদার্থ (২) জৈব পদার্থ (৩) পানি ও (৪) বায়ু।

১। খনিজ পদার্থ : আমরা পূর্বেই জেনেছি, ভূ-পৃষ্ঠ প্রকৃতপক্ষে শিলা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তি তথা তাপ, চাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, পানিপ্রবাহ ইত্যাদির প্রভাবে সময়ের ব্যবধানে আদি শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির অজৈব বা খনিজ পদার্থ সৃষ্টি করেছে। নুড়িপাথর, বালিকণা, পলিকণা ও কর্দমকণা হচ্ছে মাটির খনিজ পদার্থ। এসব খনিজ পদার্থ নানাভাবে মিশে মাটির বুনট সৃষ্টি হয়েছে। মাটিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ আয়তন ভিত্তিতে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ অর্থাৎ মাটির সর্ববৃহৎ অংশ জুড়ে আছে।

২। জৈব পদার্থ : জৈব পদার্থ মাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জীবজন্তুর মৃতদেহ, গাছপালা, লতাপাতা, খড়কুটা, প্রাণীর মলমূত্র, প্রভৃতি মাটিতে পচে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। মাটিতে আয়তনের ভিত্তিতে শতকরা ৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকে। জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয়। কেননা জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে মাটির অণুজীবগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও জৈব পদার্থ– (১) মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ধর্মাবলি উন্নত করে; (২) ভূমিক্ষয় রোধ করে (৩) মাটিতে পানি ও বায়ু চলাচল সহজতর করে (৪) মাটিস্থ কেঁচোর সংখ্যা ও এর কার্যাবলি বাড়ায়; (৫) মাটির রস ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। পানি : মাটির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পানি। মাটির বিভিন্ন কণার মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে পানি অবস্থান করে। মাটির পানি উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলোকে তরল রাখে এবং মাটিকে রসাল রাখে। বৃষ্টিপাত, বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প, ভূ-গর্ভস্থ পানি ও সেচব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত পানিই মাটির পানির প্রধান উৎস। আদর্শ মাটিতে পানির পরিমাণ হলো শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ।

৪। **বায়ু :** বায়ু মাটির একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান। মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। উদ্ভিদের শিকড় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অন্যান্য অণুজীবের কর্মতৎপরতার জন্য যে অক্সিজেনের প্রয়োজন, তা মাটিতে অবস্থানরত বায়ু সরবরাহ করে। আদর্শ মাটিতে বায়ুর পরিমাণ হলো শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ।

কাজ : মাটির গঠন উপাদানের শতকরা হারের পেপার মডেল তৈরি করে সে মডেলগুলো শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে রাখ।

পাঠ–২ : মাটির প্রকারভেদ

যেসব খনিজ কণার ব্যাস দুই মিলিমিটার বা তার কম, তাকে মাটির কণা বলা হয়। আমরা জানি, এ কণার দ্বারাই মাটির বুনট সৃষ্টি হয়। মাটির বুনট হলো মাটির বালি, পলি, কর্দমকণার তুলনামুলক পরিমাণ বা শতকরা অনুপাত। মাটির এসব কণা বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন প্রকার মাটির সৃষ্টি করে। আর মনে রাখব, এসব কণার আকারও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

কোন মাটিতে কোন ফসল জন্মায় তা জানার জন্যই মাটির শ্রেণিবিভাগ জানা খুবই দরকার। কৃষিকাজে ব্যবহারের সুবিধার জন্য বুনটের উপর ভিত্তি করে মাটিকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– (১) বেলে মাটি (২) দোআঁশ মাটি ও (৩) এঁটেল মাটি।

(১) বেলে মাটি : যে মাটিতে শতকরা ৭০ ভাগ বা তারও বেশি বালিকণা থাকে, তাকে বেলে মাটি বলে। মোটা কণাযুক্ত বেলে মাটিতে ফসলের চাষ করা যায় না। তবে বেলে মাটিতে প্রচুর কম্পোস্ট, গোবর ও সবুজ সার প্রয়োগ করে চিনা, কাউন, ফুটি, আলু, তরমুজ ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব।

চিত্র : বেলে মাটি

(২) দোআঁশ মাটি : যে মাটিতে বালিকণার পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগের কম কিন্তু ২০ ভাগের বেশি, তাকে দোআঁশ মাটি বলে। তবে আদর্শ দোআঁশ মাটিতে অর্ধেক বালিকণা এবং বাকি অর্ধেক পলি ও কর্দমকণা থাকা আবশ্যক। চাষাবাদের জন্য এ মাটি উত্তম। এ মাটিতে সব ধরনের ফসল ভালো জন্মে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকার মাটি দোআঁশ প্রকৃতির। দোআঁশ মাটিকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– (১) বেলে-দোআঁশ মাটি (২) পলি-দোআঁশ মাটি (৩) এঁটেল-দোআঁশ মাটি।

চিত্র : দোঁআশ মাটি

(৩) এঁটেল মাটি : যে মাটিতে কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ কর্দমকণা থাকে, তাকে এঁটেল মাটি বলে। এ মাটিতে পলিকণাও বেশি থাকে। ঢাকা জেলার উত্তরাংশ, টাঙ্গাইল জেলার পূর্বাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এ মাটি দেখা যায়। এ মাটিতে চাষ করা খুব কষ্টকর। জৈব সার প্রয়োগে চাষের উপযোগী করা সম্ভব। ধান, পাট, আখ ও শাকসবজি এ মাটিতে ভালো জন্মে।

চিত্র : এঁটেল মাটি

কাজ ১ : নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ- (১) মাটির বুনট কী? (২) কীভাবে মাটির বুনট নির্ধারিত হয়? (৩) বুনটের উপর ভিত্তি করে মাটি কত প্রকার ও কী কী? (৪) চাষাবাদের সবচেয়ে উপযোগী মাটি কোনটি?

কাজ ২ : বেলে, দোআঁশ ও এঁটেল মাটিতে জন্মায় এরূপ ফসলের একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ–৩ : মাটির গুণাগুণ

ফসল উৎপাদনে মাটির গুণাগুণ প্রভাব বিস্তার করে। কোন মাটিতে কোন ধরনের ফসল উৎপাদন করা যাবে তা মাটির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। মাটির সকল গুণাবলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) ভৌত গুণাগুণ (খ) রাসায়নিক গুণাগুণ (গ) জৈবিক গুণাগুণ।

(ক) মাটির ভৌত গুণাগুণ : মাটির ভৌত গুণাগুণ বলতে ১) মাটির বুনট ২) মাটির সংযুতি ৩) মাটির ঘনত্ব ৪) মাটির বর্ণ ৫) মাটির তাপমাত্রা ৬) মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ৭) মাটির বায়ু চলাচল ইত্যাদিকে বোঝায়।

(খ) মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ : মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ বলতে ১) মাটির অম্লত্ব ক্ষারত্ব ২) উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ ৩) মাটির লবণাক্ততা ইত্যাদিকে বোঝায়।

(গ) মাটির জৈবিক গুণাগুণ : মাটির জৈবিক গুণাগুণ বলতে ১) অণুজীবের প্রকার ২) অণুজীবের সংখ্যা ৩) অণুজীবের কার্যাবলি ইত্যাদিকে বোঝায়।

কৃষি ফলনে মাটির গুণাগুণের গুরুত্ব : ফসল উৎপাদনে মাটির গুণাগুণের গুরুত্ব অপরিসীম। মাটির ভৌত গুণাবলির মধ্যে মাটির বুনট, মাটির সংযুতি, মাটির ঘনত্ব ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। মাটির বুনটের পার্থক্যের কারণে মাটিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। দোআঁশ মাটিতে অধিকাংশ ফসল ভালো জন্মে। এঁটেল মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি বলে এ মাটিতে ধান ভালো জন্মে। বেলে মাটিতে বাদাম, আলু, ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি ফসল জন্মে। মাটির বালি, পলি ও কর্দমকণা যে দলাকৃতিতে সজ্জিত থাকে তাকে মাটির সংযুতি বলে। দানাদার, চুর্ণাকার সংযুতি ফসল চাষের জন্য বেশি উপযোগী। থালাকার সংযুতির মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। মাটির রাসায়নিক গুণাগুণের মধ্যে মাটির অম্লত্ব, ক্ষারত্ব, লবণাক্ততা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ফসল বেশি অম্লীয়, ক্ষারীয় বা লবণাক্ততা পছন্দ করে না অর্থাৎ নিরপেক্ষ মাটি ফসল চাষের জন্য বেশি উপযোগী। এ ধরনের মাটিতে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে ও অণুজৈবিক কার্যাবলি সক্রিয় থাকে।

২০২১

কেঁচো, ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, শৈবাল ইত্যাদি জীব ও অণুজীবের সংখ্যা, প্রকার এবং ক্রিয়াকলাপই মাটির জৈবিক গুণাবলি। এসব জীব ও অণুজীব মাটিতে হিউমাস উৎপাদন ও ফসলের জন্য পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য করার মাধ্যমে প্রভূত উপকার করে।

কাজ : বেলে, দোআঁশ ও এঁটেল মাটির গুণাগুণগুলো লিখে উপস্থাপন কর।

পাঠ–৪ : সেচ

আমরা কি জানি, জীবের দেহে কোন উপাদানটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে? কোন বস্তুটি ছাড়া পৃথিবীতে কোনো জীবের অস্তিত্ব সম্ভব নয়? কোন পদার্থটিকে জীবের জীবন বলা হয়? সবকটি প্রশ্নের উত্তরে বলব 'পানি'। তাহলে জীব এ পানি কোথা থেকে পায়? গাছ একটি জীব, সে পানি পায় সেচ বা বৃষ্টি থেকে। যখন পানি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়, তখন তা সরানোর প্রয়োজন পড়ে, যাকে নিষ্কাশন বলে। এখন আমরা পানি সেচ ও পানি নিষ্কাশন সম্পর্কে আলোচনা করব।

ফসলের গাছ বড় হওয়ার জন্য জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সরবরাহ করাকেই সেচ বলা হয়। যেকোনো জীবের বাঁচার জন্য যেমন পানি অপরিহার্য, ফসলের জন্যও তেমনি। ফসল সুন্দরভাবে বাঁচার ও ফলন দেবার জন্য মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে। খরা, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে ফসলের জমিতে পানির আবশ্যকতা দেখা দেয়। আধুনিক কৃষিব্যবস্থায় সেচ অত্যাবশ্যক।

চিত্র : খরা কবলিত জমির ফসল

চিত্র : স্বাভাবিক জমির ফসল

সেচের পানির উৎস

সেচের পানি প্রধানত ২টি উৎস থেকে পাওয়া যায়, যথা– (ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি; (খ) ভূ-গর্ভস্থ পানি। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস হচ্ছে নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, পুকুর প্রভৃতির পানি। বৃষ্টিপাতের কারণে প্রধানত এসব পানি জমা হয়।
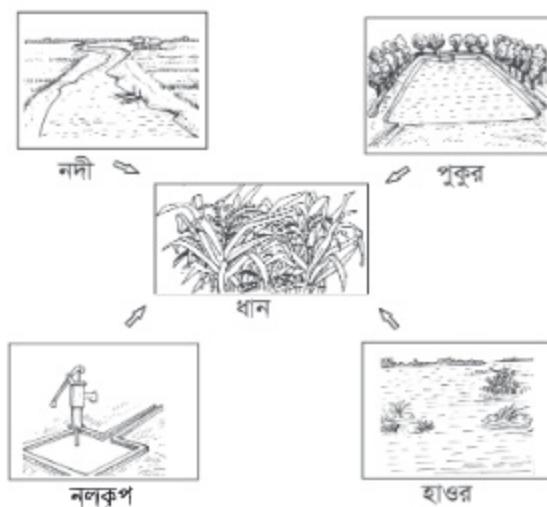
চিত্র : ধানক্ষেতে সেচের পানির বিভিন্ন উৎস

পক্ষান্তরে, কূপ খনন করে বা নলকূপ দ্বারা ভূ-গর্ভের পানি উত্তোলন করে সেচ দেওয়া হয়। এ পানিকেই ভূ-গর্ভস্থ পানি বলে। ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস হচ্ছে বৃষ্টির পানি।

পাঠ- ৫ : পানি সেচের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এ বৃষ্টিপাত সবসময় কাজে লাগে না। তাই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে ফসল চাষাবাদ করলে সবসময় ভালো ফলন পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হলেও শীত মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। এ ছাড়া দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালেও বৃষ্টিপাত কম হয়। ফলে পানির অভাবে ফসলের ফলন কম হয়। এ অবস্থায় ফসলের ফলন বাড়ানোর জন্য পানি সেচ দিতে হয়। প্রতিটি ফসলের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে পানির চাহিদায় ভিন্নতা রয়েছে। আর এই চাহিদা অনুযায়ী ফসলে পানি সেচ দিতে হয়।

চিত্র : শিকড়ের সাহায্যে পানি পরিশোষণ

সেচের পানির উপকারিতা : (১) উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে পানি পরিশোষণ করে। (২) উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি পরিশোষণের সাথে পুষ্টি উপাদান আহরণ করে। (৩) সেচের মাধ্যমে মাটির তাপমাত্রা ঠিক রাখা যায়। (৪) অণুজীবের কার্যকারিতা ও পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পায়।

অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন : জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হয়। জমি থেকে এই অতিরিক্ত পানি সরিয়ে ফেলাকেই পানি নিষ্কাশন বলে। জমিতে অতিরিক্ত পানি জমলে গাছের শিকড় অঞ্চলে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়, ফলে অনেক গাছ মারা যায়।

পাঠ-৬ : মাছ চাষে পানি
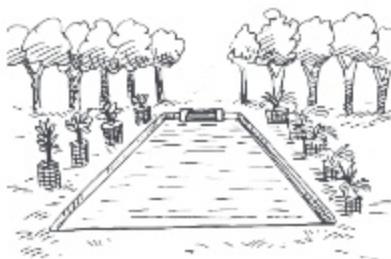
চিত্র : পুকুর   চিত্র : নদী   চিত্র : খাল

আমরা উপরের চিত্রগুলো লক্ষ করি। কী দেখতে পাচ্ছি? পুকরে পানি, নদীতে পানি ও খালে পানি। আমরা কি জানি, এ পানিতে কোন জীব বাস করে? আর এ জীব আমরা খেয়ে আমিষের চাহিদা পূরণ করে থাকি। উত্তরে আমরা বলব মাছ। তাহলে মাছ পানিতে চাষ করলে তার এ আবাস সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা দরকার। আমরা জানি, আমাদের বসবাসের জন্য যেমন বাড়ি ও বাড়ির পরিবেশ থাকা দরকার, তেমনি মাছের জন্য তার বসবাসের জায়গা পানির পরিবেশ সুন্দর থাকা দরকার। কাজেই এসো আমরা মাছ চাষে পানির গুণাগুণ ও তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করি।

পানির ভৌত গুণাগুণ ও মাছ চাষে তার প্রভাব : পানির ভৌত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মাছ চাষের পানির ভৌত গুণাগুণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. পানির বর্ণ

পানির বর্ণ হালকা সবুজ হলে তা পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব দ্রব্যের উপস্থিতির কারণে পানির বর্ণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। রং দেখে পানির উৎপাদন শক্তি আন্দাজ করা যায়। পানির রং সবুজ বা বাদামি হলে বোঝা যাবে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। পুকুরে নিয়মিত সার প্রয়োগ করলে উক্ত রং বজায় থাকবে।

২. পানির স্বচ্ছতা

পানির স্বচ্ছতা ২৫ সেন্টিমিটার বা তার কম হলে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয়। পানিতে কনুই পর্যন্ত হাত ডুবানোর পর যদি হাতের তালু দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে মাছের জন্য বেশি খাদ্য নেই। তখন পুকুরে সার দিতে হয়।
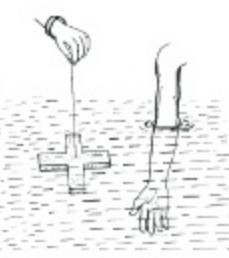
চিত্র : প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

৩. **পানির গভীরতা :** পানির গভীরতা মাছ চাষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির গভীরতা কমপক্ষে ১.৫ মিটার থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে ২ মিটার গভীরতা মাছ চাষের জন্য উত্তম। পানির গভীরতা খুব বেশি হলে সূর্যের আলো পানির গভীরে পৌঁছাতে পারে না। আবার পানির গভীরতা খুব কম হলে সূর্যের তাপে পানি গরম হয়ে উঠে।

৪. **পানির তাপমাত্রা :** পানির তাপমাত্রার উপরও মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। শীতকালে মাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং গরমকালে বেশি বাড়ে। যেমন : রুই জাতীয় মাছ চাষের জন্য ২৫° –৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তম।

৫. সূর্যালোক

সূর্যালোকের উপর খাদ্য উৎপাদন নির্ভর করে। তাই পুকুর পাড়ের বড় গাছপালা কেটে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরে ভাসমান কুচুরিপানা, শেওলা ও আগাছা ইত্যাদিও পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে।
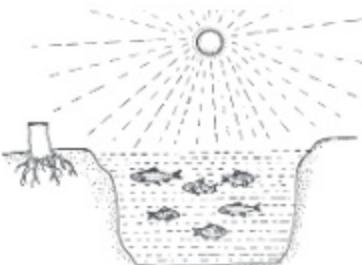
চিত্রঃ পুকুরে সূর্যালোক

পানির রাসায়নিক গুণাগুণ ও মাছ চাষে তার প্রভাব

মাছ চাষের পানির রাসায়নিক গুণাবলির মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করা হলো :

১. দ্রবীভূত অক্সিজেন : জলজ উদ্ভিদ যে অক্সিজেন ছাড়ে তা পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাতাস থেকেও কিছু অক্সিজেন সরাসরি পানিতে মিশে। পুকুরে অবস্থিত মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এ অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। অক্সিজেনের অভাবে মাছ দলবদ্ধভাবে পানির উপর ভেসে বেড়ায়। একে মাছের খাবি খাওয়া বলে।

পানিতে অক্সিজেন হ্রাসের কারণ : (১) পানিতে গাছের পাতা ও ডালপালা পচা (২) কাঁচা গোবর বেশি পরিমাণে ব্যবহার (৩) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা (৪) পানি খুব ঘোলা হওয়া।

অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের উপায় : পানির উপরিভাগে ঢেউ সৃষ্টি করে তাৎক্ষণিকভাবে পানিতে অক্সিজেনের অভাব পূরণ করা যায়। সাঁতার কেটে বা বাঁশ দিয়ে পানির উপর পিটিয়ে এ ঢেউ সৃষ্টি করা যায়।

২. **দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড :** কোনো কারণে পানিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পুকুরের তলায় অত্যধিক জৈব পদার্থ ও কাদা থাকলে অধিক তাপমাত্রায় পুকুরে এ গ্যাসের আধিক্য ঘটে।

৩. **পানির পি-এইচ :** পানি অম্লধর্মী না ক্ষারধর্মী, তা পি-এইচ মিটার দ্বারা পরিমাপ করা যায়। পি-এইচ ৭-এর কম হলে পানি অম্লীয়, ৭-এর বেশি হলে পানি ক্ষারীয় এবং ৭ হলে পানি নিরপেক্ষ। সামান্য ক্ষারধর্মী পানি মাছ চাষের জন্য ভালো। তবে পানির পি-এইচ ৬.৫–৮.৫ হলে পানি প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হয়।

৪. **ফসফরাস :** ফসফরাস পানিতে মাছের খাদ্যের পরিমাণ বাড়ায়।

৫. **নাইট্রোজেন :** নাইট্রোজেন জলজ অণুজীবের জন্য খুবই উপকারী। আর এ অণুজীবই মাছের প্রধান খাদ্য।

৬. **পটাশিয়াম :** মাছের খাদ্যচাহিদা পূরণের জন্য পানিতে পটাশ দিতে হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, মাছ চাষে পানির অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পানির গুণাগুণ এর উপর জলাশয়ে মাছের উৎপাদন নির্ভর করছে।

কাজ : 'মাছ চাষে পানির' গুণাগুণের প্রভাব দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

পাঠ–৭ : গৃহপালিত পশু-পাখির খাবার পানি

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা কোনো জীবই বাঁচতে পারে না। পুষ্টি উপাদান দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের জন্য পানি প্রয়োজন। এটি হজম, বিপাকপ্রক্রিয়া ও দূষিত পদার্থ দেহ থেকে নির্গত হতে সাহায্য করে। শরীরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পানির ভূমিকা রয়েছে। পানি জীবদেহের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। দেহের গঠনের উপাদানের মধ্যে পানির পরিমাণ সবচেয়ে অধিক। প্রাণিদেহের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই পানি।
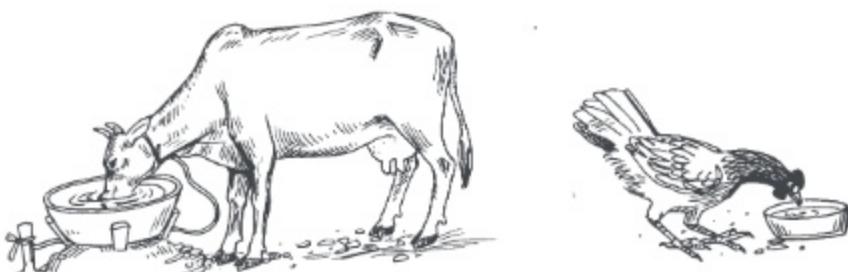
চিত্র : গৃহপালিত পশু-পাখি পানি পান করছে

গৃহপালিত পশু-পাখির খাবার পানির উৎস : নলকূপ, কুয়া, পুকুর ইত্যাদির পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানি।
পশু-পাখির দেহে পানির কার্যকারিতা : (১) পানি খাদ্যকে শোষণ করতে সাহায্য করে। (২) দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। (৩) পুষ্টি উপাদান কোষে পৌঁছাতে সাহায্য করে। (৪) দেহে তারল্য বজায় রাখে (৫) বিভিন্ন প্রকার পাচকরস পরিবহনে সাহায্য করে।

পশু-পাখির পানির ঘাটতিজনিত সমস্যা : পরিমিত পরিমাণ পানি গ্রহণ না করলে তাদের অন্যান্য খাদ্য গ্রহণ ও ব্যবহারে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। পশু-পাখির উৎপাদন ও ওজন কমে যাবে। পশু-পাখির গর্ভকালীন পানির অভাবে পেটের বাচ্চা ও ডিম উৎপাদন হুমকির সম্মুখীন হবে। এমনকি পানির অভাবে মারাও যেতে পারে।

সমাধান : পশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে। পশু-পাখি যাতে কোনোভাবেই পঁচা বা দূষিত পানি না খেতে পারে, সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। পানি জীবাণুমুক্ত হতে হবে। এছাড়া পানির প্রয়োজনীয়তা খাদ্য, আবহাওয়া ও বয়সের উপর নির্ভর করে। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে পানি বেশি প্রয়োজন। শুকনো ঘাস ও দানাদার খাদ্য বেশি খাওয়ালে পানি বেশি প্রয়োজন হবে।

পানির চাহিদা : দুধেল গাভির পানির বেশি প্রয়োজন। একটি দুধেল গাভি দৈনিক ৩০-৪০ লিটার পানি পান করে থাকে। একটি মুরগি তার খাদ্যের দ্বিগুণ পানি পান করে। হিসাব করে দেখা গেছে, একটি মুরগি দৈনিক ২০০-৩০০ মিলি পানি পান করে।

কাজ : 'দুধেল গাভিকে অপর্যাপ্ত খাবার পানি খাওয়ালে কী হবে' সে সম্পর্কে খাতায় লিখ।

পাঠ–৮ : বীজের বৈশিষ্ট্য

উদ্ভিদের বংশবিস্তারের মাধ্যম হলো বীজ। বীজ থেকেই নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। সাধারণভাবে বীজ বলতে উদ্ভিদের নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে বোঝায়। যেমন: ধান, গম, পাট ইত্যাদির বীজ। তবে ব্যাপকভাবে বীজ বলতে উদ্ভিদের যে কোনো জীবন্ত অংশ যা পরবর্তীতে বংশবিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ধান, মিষ্টি আলুর লতা, আখের কাণ্ড, পাথর কুচির পাতা, পেঁয়াজ, গোলআলু ইত্যাদি।
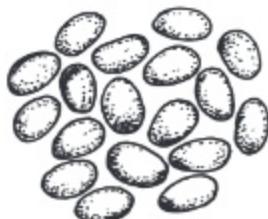
চিত্র : সয়াবিন (সোহাগ)   চিত্র : বাদাম   চিত্র : ঢেড়ঁস
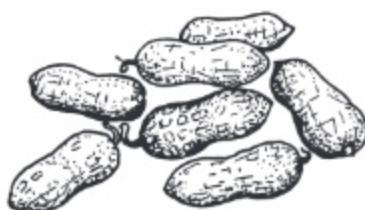
চিত্র : ভুট্টা   চিত্র : মাষকলাই (বারি-৩)   চিত্র : শসা

> কাজ : শ্রেণিকক্ষে বাংলাদেশে জন্মে এমন কিছু উদ্ভিদের বীজ দেখে এগুলো কোন কোন উদ্ভিদের বীজ তা শনাক্ত কর ।

পাঠ- ৯ : ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য

আমরা এ পর্যন্ত অনেক বীজ দেখলাম এবং বীজের নাম শনাক্ত করতে পারলাম। এবার আমরা ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব।

১. **বীজ বিশুদ্ধতা :** কাঙ্ক্ষিত ফসলের বীজের সাথে যেন অন্য ফসলের বীজ, আগাছার বীজ, কাঁকর জাতীয় পদার্থ প্রভৃতি মিশ্রিত না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এতে বীজের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে না।

২. **জাত বিশুদ্ধতা :** কোনো বীজের নমুনায় একই ফসলের অন্য জাতের বীজ থাকলে বীজের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। যেমন : নাইজারশাইল ধানের বীজের সাথে বিনাশাইল ধানের মিশ্রণ থাকলে জাত বিশুদ্ধতা থাকে না। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করলে জাত বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।

৩. **গজানোর ক্ষমতা :** এ বিষয়টিকে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বলে। কোনো বীজ নমুনায় কতোটি বীজ অঙ্কুরিত হবে সে হিসাব থেকেই বীজের ভালোমন্দ গুণ বিচার করা হয়। উত্তম বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ১০০% পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু সবসময় সব বীজ এ হারে গজায় না। কমপক্ষে ৮০% গজানোর হার সম্পন্ন বীজকে উত্তম বীজ বলা যায়।

৪. **বীজের জীবনীশক্তি তেজ :** নমুনা বীজের চারা যদি সতেজ, সজীব ও স্বাস্থ্যবান হয় এবং প্রতিকূল অবস্থায় তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে পারে, তবে সে বীজকে তেজস্বী বীজ বলা হয়।

৫. **বীজের আর্দ্রতা :** নমুনা বীজের মধ্যে শতকরা কতো ভাগ পানি আছে, তাই বীজের আর্দ্রতা। বীজের আর্দ্রতা বীজকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন : দানা শস্যের বীজের আর্দ্রতা ৮–১০% রাখা উত্তম।
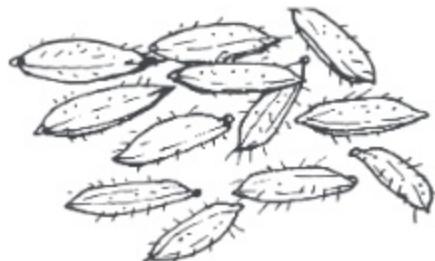
চিত্র : ধানের বীজ (স্বাভাবিক)

চিত্র : ধানের বীজ (অস্বাভাবিক)

৬. **বীজের বর্ণ :** প্রত্যেক জাতের বীজের স্বতন্ত্র রং থাকে। আর তাই ভালো বীজের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উজ্জ্বল রং থাকতে হবে। ভালো বীজ চেনার প্রথম লক্ষণই হচ্ছে বীজের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা।

পাঠ–১০ : বীজের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্নভাবে বীজের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন :

১। ব্যবহারের ভিত্তিতে বীজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) **উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ :** উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে, নিষিক্ত ও পরিপক্ব ডিম্বককে বীজ বলে। যেমনঃ ধান, পাট, গম ইত্যাদি বীজ।

(খ) **কৃষিতাত্ত্বিক বীজ :** কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে, উদ্ভিদের যেকোনো অংশ যা উপযুক্ত পরিবেশে আপন জাতের নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে, তাকে কৃষিতাত্ত্বিক বীজ বলে। যেমন: আদা ও হলুদের কন্দ, মিষ্টি আলুর লতা, কাঁকরোলের মূল, আখের কাণ্ড ইত্যাদি।

২। বীজাবরণের উপস্থিতির ভিত্তিতে বীজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) **অনাবৃত বীজ :** এসব বীজে কোনো আবরণ থাকে না। যেমন: পাইন, সাইকাস ইত্যাদি।

(খ) **আবৃত বীজ :** এসব বীজের আবরণ থাকে। যেমন: ধান, সরিষা, ইত্যাদি।

৩। বীজপত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে বীজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) **একবীজপত্রী বীজ :** এসব বীজে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে। যেমন; ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি

(খ) **দ্বিবীজপত্রী বীজ :** এসব বীজে দুটি বীজপত্র থাকে। যেমন: ছোলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

(গ) **বহুবীজপত্রী বীজ :** এসব বীজে দুইয়ের অধিক বীজপত্র থাকে। যেমন: পাইন।

কাজ : বিভিন্ন বীজের কয়েকটি নমুনা মিশ্রণ থেকে নমুনা বীজগুলোর শ্রেণিবিন্যাস কর।

পাঠ-১১ : সারের প্রকারভেদ

আমরা যেমন খাবার খাই, তেমনি উদ্ভিদও মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। উদ্ভিদের জীবনচক্র সম্পন্ন করার জন্য ১৭টি অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়। তবে সবগুলো পুষ্টি উপাদানই উদ্ভিদের জন্য সমান পরিমাণে প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে কিছু পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের জন্য বেশি পরিমাণে লাগে যেমন: নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদি। এই উপাদানগুলোকে আমরা জমিতে সার হিসেবে প্রয়োগ করি যেমন: ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ইত্যাদি।

উৎস অনুযায়ী সারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) জৈব সার।

খ) রাসায়নিক সার।
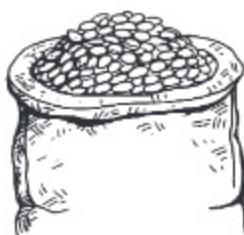
চিত্র : ইউরিয়া

চিত্র : টিএসপি

চিত্র : এমওপি

(ক) জৈব সার

যেসব সার জীবের দেহ থেকে প্রাপ্ত অর্থাৎ উদ্ভিদ বা প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রস্তুত করা যায়, তাদেরকে জৈব সার বলে। যেমন- গোবর সার, কম্পোস্ট সার, সবুজ সার, খৈল ইত্যাদি। গাছের প্রয়োজনীয় প্রায় সব খাদ্য উপাদানই জৈব সারে থাকে

জমিতে জৈব সার প্রয়োগের সুবিধা

- জৈব সারে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদানই থাকে।
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- মাটির অণুজীবের কার্যাবলি বাড়ায়।
- মাটির সংযুতির উন্নতি ঘটায়।
- মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- মাটিতে বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করে।
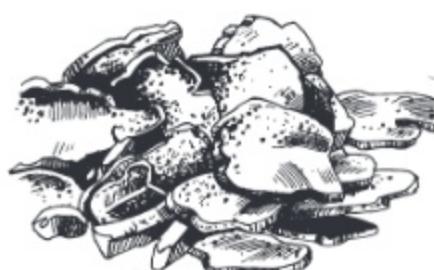
চিত্র : জৈব সার

(খ) রাসায়নিক সার

কলকারখানায় যে সকল সার তৈরি করা হয় তাদেরকে রাসায়নিক সার বলে। যেমন: ইউরিয়া, ডিএপি, জিপসাম, দস্তাসার।

কয়েকটি সারের নাম ও এদের সরবরাহকৃত পুষ্টি উপাদানের নাম নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো :

সার	পুষ্টি উপাদান
ইউরিয়া	নাইট্রোজেন
টিএসপি	ফসফরাস, ক্যালসিয়াম
এমওপি	পটাশিয়াম
ডিএপি	নাইট্রোজেন, ফসফরাস
জিপসাম	সালফার, ক্যালসিয়াম
দস্তাসার	জিংক, সালফার

রাসায়নিক সার প্রয়োগের সুবিধা

১। উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুযায়ী মাটিতে সঠিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদান যোগ করা যায়।

২। উদ্ভিদের পুষ্টি ঘাটতি দ্রুত মিটানোর জন্য রাসায়নিক সার খুবই কার্যকরী।

৩। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখে।

রাসায়নিক সার প্রয়োগের অসুবিধা

১। সুষম পরিমাণে ব্যবহার না করলে মাটি ও ফসলের ক্ষতি যায়।

২। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।

৩। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে পরিবেশদূষণ ঘটে।

কাজ : জৈব সার ও রাসায়নিক সারের নামের তালিকা তৈরি কর।

পাঠ-১২ : কৃষিকাজে সারের ব্যবহার

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই অল্প জমি থেকে বেশি পরিমাণে ফসল উৎপাদনের জন্য সার ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। তাই বাংলাদেশে সারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে প্রধানত জৈব ও অজৈব এই দুই ধরনের সার ব্যবহার হচ্ছে। তবে কোন সার কী পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন :

১। মাটির উর্বরতার অবস্থা।

২। উৎপাদিত ফসলের ধরন ও জাত।

৩। সার প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি।

৪। সার অপচয়ের মাত্রা।

৫। মাটির আর্দ্রতার অবস্থা।

কাজ : 'কৃষি ফলনে সারের ভূমিকা' বিষয়ে দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. উদ্ভিদের .... মাধ্যম হলো বীজ।

২. আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায়........................ অত্যাবশ্যক।

৩. ইউরিয়া .... সার।

৪. জৈব সার .... উর্বরতা বাড়ায়।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. টিএসপি সার	বংশবিস্তার ।
২. ভূ-গর্ভস্থ সেচ	খনিজ পদার্থ ।
৩. বীজ উদ্ভিদের প্রধান মাধ্যম	মিষ্টি আলুর লতা ।
৪. মাটি গঠনে বেশি থাকে	নলকূপ ।
৫. কৃষিতাত্ত্বিক বীজ	ফসফরাস ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বেলে মাটিতে কী কী ফসল চাষ করা যায়?

২. বীজের গুণাবলি কী কী?

৩. কীভাবে বীজের জাত বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মাটির গঠন উপাদানগুলো বর্ণনা কর ।

২. বীজের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর ।

৩. উদাহরণসহ সারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ?

ক. আদা   খ. ভুট্টা
গ. পাট   ঘ. সরিষা

২. ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ কোন খাদ্য উপাদান পায়?

ক. নাইট্রোজেন   খ. ফসফরাস
গ. সালফার   ঘ. পটাশিয়াম

৩. জীবদেহে পানির কাজ হচ্ছে-

i. পুষ্টি উপাদান কোষে পৌছানো
ii. দেহে তারল্য বজায় রাখা
iii. পাচকরস পরিবহনে সাহায্য করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪. অঙ্গ ব্যবহার করে বংশবিস্তার করা যায় কোন ফসলের?

ক. ধান, শসা, গম খ. পাট, সরিষা, সয়াবিন
গ. ভুট্টা, মাষকলাই, বাদাম ঘ. আখ, পটল, মিষ্টি আলু

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

'ধলেশ্বরী' নদী তীরের বাসিন্দা মর্জিয়া বেগম দুগ্ধ খামার করে কাঙ্খিত পরিমাণে দুধের উৎপাদন পেলেন। তার গাভি দুটি সুস্থ ও সুন্দর মসৃণ চামড়ার অধিকারী। খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন যত্নের মধ্যে তিনি প্রতিদিন গাভি দুটিকে প্রয়োজনীয় পানি পান করাতেন।

৫. মর্জিয়া বেগম দুটি গাভিকে কত লিটার পানি দিতেন?

ক. ২০-৪০ লিটার খ. ৬০-৮০ লিটার
গ. ৪০-৬০ লিটার ঘ. ৮০-১০০ লিটার

৬. মর্জিয়া বেগমের গাভি দুটির মসৃণ চামড়া থাকার কারণ কোনটি?

ক. পরিমাণমত পানি পান করানো
খ. প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্য খাওয়ানো
গ. নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচা ঘাস খাওয়ানো
ঘ. নিয়মিত গাভিগুলোকে গোসল করানো

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. প্রত্যেক ফসল মাড়াই মৌসুমেই কৃষক মজিদের বাড়ির আঙ্গিনায় খড়কুটা, চিটা ও লতাপাতা ইত্যাদি আবর্জনায় ভরে যায়।এতে বাড়ির চারপাশের পরিবেশ নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে মজিদ উক্ত আবর্জনা সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি গ্রহণ করলেন এবং তার কৃষিজমিতে এগুলো প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ক. জৈব পদার্থ কাকে বলে?

খ. জমিতে ফসল উৎপাদন বুনটের উপর নির্ভরশীল। ব্যাখ্যা কর।

গ. মজিদ কীভাবে তার বাড়ির আবর্জনা সদ্ব্যবহার করবে? পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মজিদের সিদ্ধান্তটি তার কৃষি কর্মকাণ্ডকে কীভাবে প্রভাবিত করবে তা বিশ্লেষণ কর।

২.

গ্রুপ	মাটির কণার প্রকৃতি	মাটির প্রকার	ফসল/ বৈশিষ্ট্য
ক	৭০ ভাগ বালি	?	ফুটি, বাঙ্গি, তরমুজ
খ	৪০ ভাগ বালি	দোআঁশ	?
গ	৬০ ভাগ বালি	?	ধান চাষের উপযোগী কর

ক. মাটি কাকে বলে?

খ. জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ছকের গ্রুপ গ-এর মাটিকে কীভাবে ধান চাষের উপযোগী করা যায়, তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছকের কোন গ্রুপের মাটি ফসল চাষের জন্য উত্তম- কারণ বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি ও জলবায়ু

কৃষিকাজ আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানের পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে ফসল চাষ, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশু-পাখি পালনের উপর। আবার জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। আমরা এ অধ্যায়ে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধারণা, উপাদানসমূহ এবং কৃষিকাজে এর প্রভাব ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানব। পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চলগুলো কী, কী? বাংলাদেশের বৃষ্টিপাত, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস প্রবণ অঞ্চলগুলো সম্পর্কেও জানব।
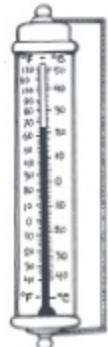
চিত্র : বায়ুর গতিমাপক যন্ত্র — চিত্র : তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র — চিত্র : বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- কৃষি কার্যক্রমে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিত্তিতে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারব।
- বাংলাদেশের মানচিত্রে কম বৃষ্টি, বেশি বৃষ্টি, বন্যাপ্রবণ, জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ- ১ : আবহাওয়া ও জলবায়ু

আবহাওয়া : আমরা রেডিও ও টেলিভিশনে আবহাওয়ার খবর শুনি । এ খবর থেকে দিনের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি তথ্য জানতে পাই । আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আকাশ কেমন থাকবে সে তথ্যও জানতে পারি । আগাম এসব তথ্যকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলে । সুতরাং কোনো স্থানের দৈনন্দিন বায়ুমণ্ডলের অবস্থাকে আবহাওয়া বলে । আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১) স্থানীয় মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত হয় ।
২) আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তনশীল ।
৩) মাটির গুণাবলিতে তেমন প্রভাব ফেলে না ।
৪) কোনো কোনো অঞ্চলে ফসলের পরিচর্যায় আবহাওয়া প্রভাব বিস্তার করে ।

জলবায়ু : জলবায়ু পরিবর্তনের কথাটি আমরা প্রায়ই শুনতে পাই । জলবায়ু সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে হয় । কোনো স্থানের ২৫-৩০ বছরের আবহাওয়ার গড়কে সেই স্থানের জলবায়ু বলে । জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১) জলবায়ু কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের বায়ুমণ্ডলের গড় অবস্থা ।
২) জলবায়ু ধীরে পরিবর্তনশীল ।
৩) মাটির গুণাবলিতে প্রভাব ফেলে ।
৪) কোনো কোনো অঞ্চলে ফসলের প্রকার ও জাত নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে ।

কাজ : আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য পয়েন্ট আকারে খাতায় লেখ এবং উপস্থাপন কর ।

এখন আমরা আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

আবহাওয়ার উপাদান :

১) বারিপাত : বায়ুমণ্ডল থেকে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত পানিকে বারিপাত বলে । বৃষ্টি, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, শিশির ইত্যাদি বারিপাতের অন্তর্ভুক্ত ।
২) তাপমাত্রা : কোনো স্থানে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কত গরম বা ঠাণ্ডা, তাই তাপমাত্রা ।
৩) বায়ুর গতি : কোনো স্থানে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বাতাস কত বেগে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই বায়ুর গতি ।
৪) বায়ুর দিক : বাতাস কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, সেটাই বায়ুর দিক ।
৫) বায়ুর আর্দ্রতা : বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে ।
৬) বায়ুর চাপ : ভূ-পৃষ্ঠের উপর বায়ু যে বল প্রয়োগ করে, তাকে বায়ুর চাপ বলে ।
৭) মেঘমালা : আকাশে মেঘের পরিমাণ ।
৮) দৃষ্টিগ্রাহ্যতা : খালি চোখে যত দূর পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে দৃষ্টিগ্রাহ্যতা বলে ।
৯) সূর্যালোক : দিনে কত ঘণ্টা সূর্যের আলো পাওয়া যায় তার পরিমাণকে সূর্যালোক বলে ।

জলবায়ুর উপাদান

১) সৌরবিকিরণ : পৃথিবীতে সব শক্তির উৎস হলো সৌরশক্তি। স্থান ও ঋতু ভেদে সৌরবিকিরণ প্রাপ্তির পার্থক্যের কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর তারতম্য হয়ে থাকে। সৌরবিকিরণ পৃথিবী পৃষ্ঠকে উষ্ণ করে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া পানির বাষ্পীভবন, বায়ুর গতিশীলতা, মেঘমালা সৃষ্টি ইত্যাদি সৌরবিকিরণের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়।

২) বায়ুপুঞ্জ : বায়ু পুঞ্জীভূত আকারে নির্দিষ্ট পথে চলাচল করে। বায়ুপুঞ্জের উৎস স্থানের উপরও কোনো স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু নির্ভর করে।

৩) বায়ুচাপ প্রক্রিয়া : বায়ুচাপের হ্রাস-বৃদ্ধি বৃষ্টিপাতের মৌসুমকে প্রভাবিত করে। বায়ুচাপ হ্রাস পেলে সাইক্লোন, মেঘ-বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে। বায়ুচাপ বাড়লে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে।

৪) সমুদ্রস্রোত : সমুদ্রস্রোত উপকূলবর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে। শীতল স্রোতের উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়ে এলে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত কমে। স্রোত উষ্ণ হলে দুটোই বাড়ে।

৫) ভূমিবন্ধুরতা : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোনো স্থানের উচ্চতা ঐ স্থানের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চতা বাড়লে তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ কমে।

নতুন শব্দ : আবহাওয়া, জলবায়ু, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান।

পাঠ- ২ : কৃষিকাজে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব

কৃষিকাজ আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ পাঠে আমরা ফসল চাষ, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশু-পাখি পালনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

১। ফসল চাষ : বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশে সারা বছর নানা ধরনের ফসল জন্মে। বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন ধরনের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা বিদ্যমান থাকায় এ দেশ শস্য-শ্যামলা দেশে পরিণত হয়েছে। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে এ দেশে প্রচুর ধান, পাট, শাকসবজি, ফলমূল জন্মে। অন্যদিকে শীতকালীন জলবায়ুর প্রভাবে নানা প্রকার ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি, মসলা ইত্যাদি রবি শস্য জন্মে। সুতরাং কৃষি উৎপাদনে জলবায়ুর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দৈনন্দিন কৃষিকাজ আবহাওয়ার উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। জমি তৈরি, বীজ বপন, সার প্রয়োগ, পানিসেচ, ফসল কর্তন, রোগ ও পোকামাকড়ের বিস্তার ইত্যাদি আবহাওয়ার উপাদান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন–বৃষ্টি হলে জমি চাষ করা যায় না, আবার রোপা আমন রোপণের জমি তৈরির জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন।

২। মাছ চাষ : বাংলাদেশে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা ইত্যাদি পানিতে ভরে যায়। এসব জলাশয়ে প্রচুর মাছ উৎপাদিত হয়। মাছের উৎপাদন ও বংশবিস্তারে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব খুবই বেশি।

৩। **গৃহপালিত পশু-পাখি :** বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি গৃহপালিত পশু-পাখি পালনের উপযোগী। পশু-পাখির খাদ্যের জন্য এদেশে বিভিন্ন ধরনের ঘাস, লতা, গুল্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলো অস্বাভাবিক আচরণ করছে। ফলে কৃষি উৎপাদন হুমকির মুখে পড়ছে। এখন আমরা জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জানব।

জলবায়ু পরিবর্তন : জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের গ্রিনহাউস প্রভাব বুঝতে হবে। শীতপ্রধান দেশে দামি সবজি, ফল গ্রিনহাউস বা কাচঘরে জন্মায়। কাচঘরের তাপমাত্রা বাইরের থেকে গরম থাকে, যা ঐ সব ফসলের জন্য অনুকূল। কাচঘরে যে আলো প্রবেশ করে তা বাইরে বের হতে পারে না বরং দুর্বল হয়ে তাপ উৎপাদন করে। ফলে কাচঘর গরম থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলও গ্রিনহাউসের মতো অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠছে। মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। এ গ্যাসগুলো তাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করে তুলছে। একে গ্রিনহাউস প্রভাব বলে এবং এর জন্য দায়ী গ্যাসগুলোকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলে। উনিশ শতকের শেষভাগ হতে গ্রিনহাউস প্রভাবের কারণে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। এটাই জলবায়ু পরিবর্তন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ : শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের ভোগ-বিলাসী জীবনযাপনের কারণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, যানবাহন, গৃহকার্যে জৈব জ্বালানি পোড়াতে হয়। ফলে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। অন্যদিকে বিশ্বে প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের খাদ্য, আবাসন ইত্যাদির জন্য বিপুল পরিমাণ বনভূমি উজাড় হচ্ছে। ফলে গাছ কর্তৃক কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণের ভারসাম্য বজায় থাকছে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চল ও পর্বতের হিমবাহের বরফ গলা, মরুকরণপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। ফলে অতিবৃষ্টি, খরা, লবণাক্ততা, বন্যা, বন্যার তীব্রতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি, অতি গরম, অতি ঠাণ্ডা ইত্যাদি দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

কাজ : কৃষিকাজে জলবায়ুর গুরুত্ব আলোচনা করে খাতায় লেখ।

নতুন শব্দ : জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রিনহাউস প্রভাব, গ্রিনহাউস গ্যাস।

পাঠ- ৩ : বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা ও দূরত্ব, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ বা সমভাবাপন্ন। পরিমিত বৃষ্টিপাত, মধ্যম শীতকাল ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। শীতকালে (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বায়ুতে তেমন জলীয়বাষ্প থাকে না। ফলে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। অন্য দিকে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত মৌসুমি বায়ুতে যথেষ্ট জলীয়বাষ্প থাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া মার্চ-এপ্রিল মাসে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হঠাৎ ঝড় ও ঘূর্ণিঝড় হতে দেখা যায়। এটি কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। এ ঝড়ের সাথে প্রায়ই শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়া গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। যার ফলে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় উপকূল এলাকায় আঘাত হানে। বাংলাদেশের জলবায়ুর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো :

তাপমাত্রা : বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১° সেলসিয়াস। এ দেশে শীতকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১১° সেলসিয়াস হয়ে থাকে। জানুয়ারি শীতলতম মাস এবং গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস হয়ে থাকে। শীতকালে দেশের দক্ষিণভাগে উপকূলের কাছাকাছি তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং উত্তর দিকে তাপমাত্রা কম থাকে। শীতের স্থায়িত্ব ও তীব্রতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, যথা- T_1, T_2, T_3, T_4 ও T_5। তবে T_1 অঞ্চলে শীতের স্থায়িত্ব ও তীব্রতা সবচেয়ে কম, পর্যায়ক্রমে তা বেড়ে T_5 অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি হয়।

বৃষ্টিপাত : বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট তারতম্য হয়ে থাকে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১১০০ মিলিমিটার থেকে ৪৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ বৃষ্টিপাতের প্রায় ৯০ শতাংশ এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে হয়ে থাকে। শীতকালে অতি সামান্য বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয় নাটোরের লালপুরে এবং সর্বোচ্চ সিলেটের লালাখালে।

আর্দ্রতা : ঋতুভেদে এদেশে আর্দ্রতার বেশ পার্থক্য দেখা যায়। শীতকালে বায়ুতে জলীয়বাষ্প কম থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বায়ু বেশ আর্দ্র থাকে। বায়ুতে এ আর্দ্রতা বৃষ্টিপাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শীতকালে বাতাসের গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৩% থেকে ৮৪% হয়ে থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যা ৮৩% থেকে ৮৯% পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ প্রায়ই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়।
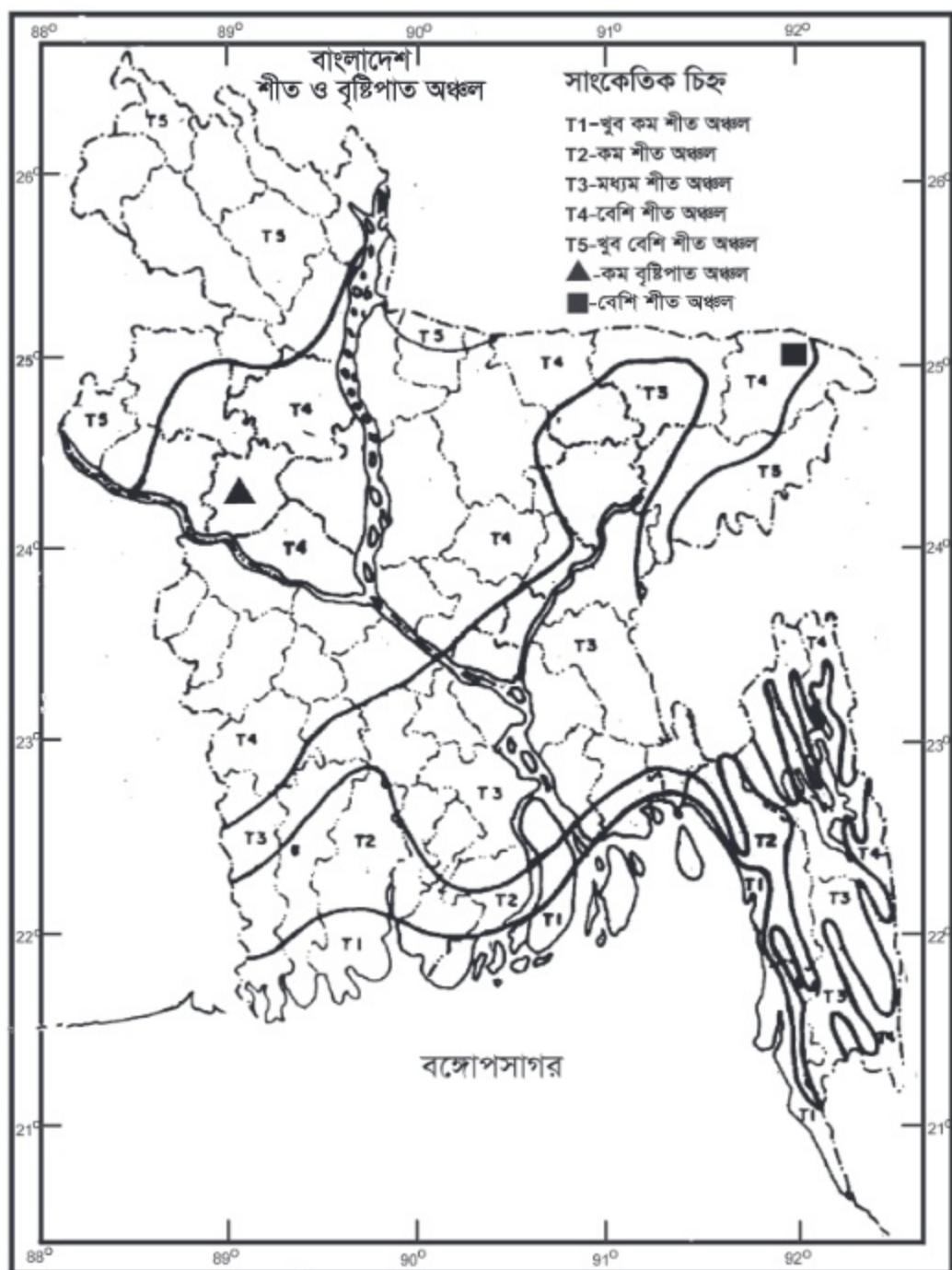
চিত্র: মানচিত্রে বাংলাদেশের শীতের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চল এবং বৃষ্টিপাত অঞ্চল

২০২৫

পাঠ- ৪ : মাটি, পানি ও জলবায়ুর ভিত্তিতে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি, পানি ও জলবায়ুর ভিন্নতা রয়েছে। এ ভিন্নতার কারণেই এক এক অঞ্চলে এক এক রকম ফসল ভালো জন্মে। মাটি, পানি ও জলবায়ুর ভিত্তিতে সমগ্র বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এ শ্রেণিভাগ মাটির ধরন, উর্বরতা, ফসল জন্মানোর প্রকৃতি, জমিতে বন্যার সময় পানির উচ্চতা, এলাকাভেদে ফসল জন্মানোর সময়সীমা, বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রাকে বিবেচনা করে করা হয়েছে।

৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো

১. পুরাতন হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি অঞ্চল, ২. সক্রিয় তিস্তা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ৩. তিস্তা বাঁক প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ৪. করতোয়া-বাঙালি প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ৫. নিম্নতর আত্রাই অববাহিকা অঞ্চল ৬. নিম্নতর পুনর্ভবা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ৭. সক্রিয় ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ৮. নতুন ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ৯. পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ১০. সক্রিয় গঙ্গা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ১১. উঁচু গঙ্গা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ১২. নিচু গঙ্গা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ১৩. গঙ্গার জোয়ার-ভাটা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ১৪. গোপালগঞ্জ খুলনা বিল অঞ্চল, ১৫. আড়িয়াল বিল অঞ্চল, ১৬. মধ্য মেঘনা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ১৭. নিম্নতর মেঘনা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ১৮. নতুন মেঘনা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ১৯ পুরানো মেঘনা মোহনা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ২০. সুরমা-কুশিয়ারা পূর্বদিকস্থ প্লাবিত ভূমি অঞ্চল, ২১. সিলেট অববাহিকা অঞ্চল, ২২. উত্তর ও পূর্বাঞ্চল পাদদেশীয় সমভূমি অঞ্চল, ২৩. চট্টগ্রাম উপকূল সমভূমি অঞ্চল, ২৪. সেন্টমার্টিন্স প্রবাল দ্বীপ অঞ্চল, ২৫. সমতল বরেন্দ্র অঞ্চল, ২৬.উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চল, ২৭. উত্তর-পূবাঞ্চলীয় বরেন্দ্রভূমি অঞ্চল, ২৮. মধুপুর অঞ্চল, ২৯. উত্তরাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য অঞ্চল, ৩০. আখাউড়া সোপান অঞ্চল।

কাজ : বাংলাদেশের মানচিত্রে কৃষি পরিবেশ অঞ্চলগুলোকে ৫টি বৃহত্তর অঞ্চলে ভাগ কর এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : কৃষি পরিবেশ অঞ্চল।
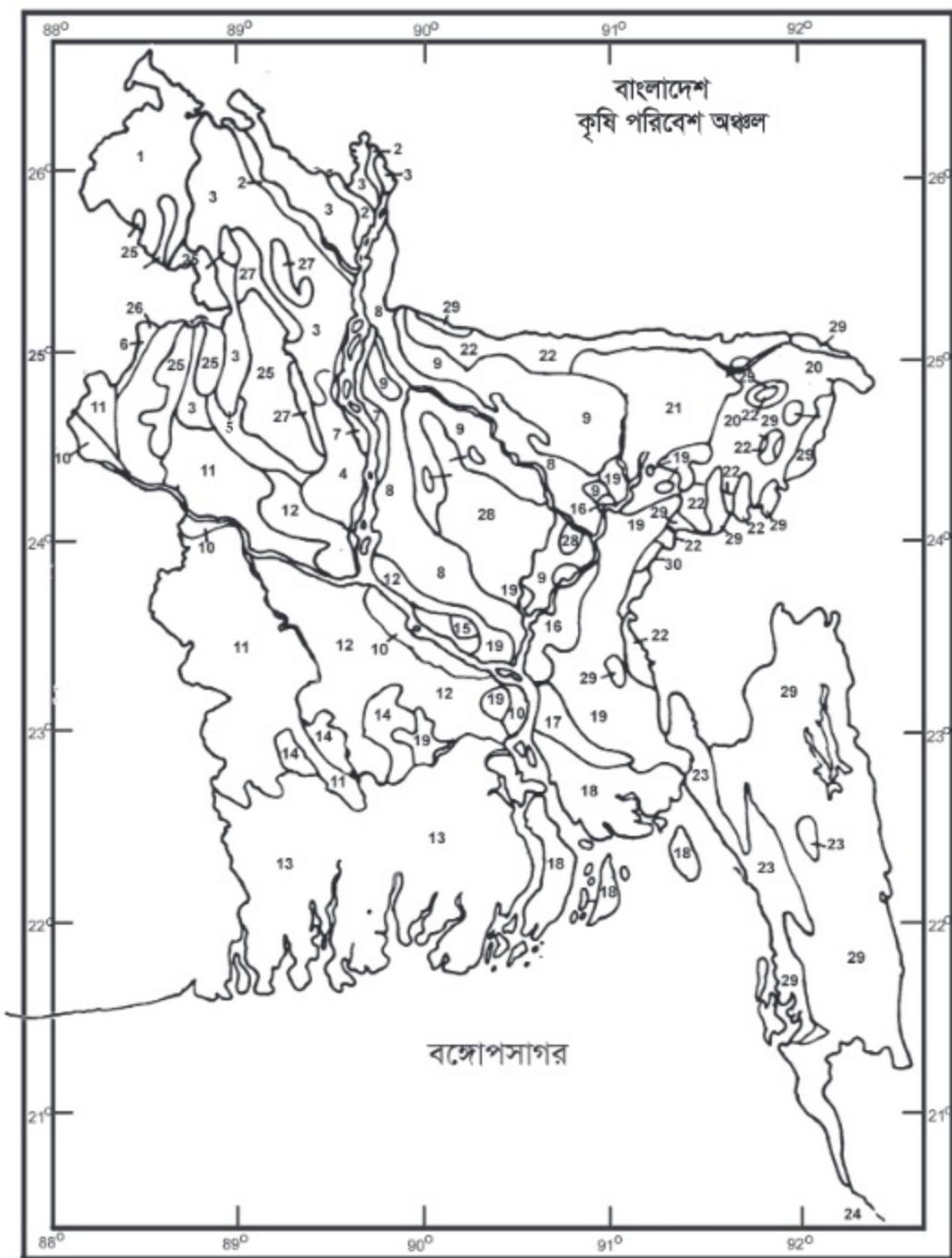
চিত্র : মানচিত্রে বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল

পাঠ-৫ : বাংলাদেশের বন্যা, খরা ও জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ অঞ্চল

বন্যা : বন্যা পানিজনিত সৃষ্ট একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশে চার ধরনের বন্যা দেখা যায়, যথা–

১) ঢল বন্যা : বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ের পাদদেশ অঞ্চলে এ ধরনের বন্যা দেখা দেয়। হঠাৎ করে এপ্রিল ও মে মাসে সীমান্তে পাহাড়ি ঢলের কারণে এ বন্যা সৃষ্টি হয়। এ বন্যার পানি কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। হাওর এলাকার বোরো ধান পাকার সময় প্রায়ই ঢল বন্যায় ফসলহানি হয়ে থাকে।

২) বৃষ্টিজনিত বন্যা : অতিবৃষ্টির কারণে দেশের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে এ বন্যা দেখা দেয়। দেশের উত্তর, পশ্চিম এবং মধ্যাঞ্চলে এ ধরনের বন্যা দেখা দেয়।

৩) নদীবাহিত বন্যা : বাংলাদেশের উজানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে সে পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। দেশের প্রধান নদ-নদীগুলো পলি পড়ে ভরাট হওয়ায় এ বিপুল পরিমাণ পানি দ্রুত পরিবহন করতে পারে না। ফলে দেশের মধ্যাঞ্চল তথা পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা হয়। বিগত ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালে এ অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল।

৪) উপকূলীয় ঝড়-জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যা : বঙ্গোপসাগরে বড় ধরনের নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে তার প্রভাবে ঘূর্ণিঝড় হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাস হয়। সাগরের লোনা পানি উপকূলীয় এলাকায় তীব্র বেগে উঁচু হয়ে প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি করে। ফলে মানুষের জীবনহানিসহ ফসল, মাছ, গবাদি পশু-পাখি, ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন : বিগত সিডর ও আইলার কারণে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

খরা : শুষ্ক মৌসুমে ক্রমাগত ২০ দিন বা এর বেশি দিন ধরে কোনো বৃষ্টিপাত না হলে তাকে খরা বলে। খরার ফলে মাটিতে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় রসের ঘাটতি দেখা দেয়। এতে ফসলের ফলন ১৫-৯০ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। বাংলাদেশের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা অতি খরাপ্রবণ এলাকা।

কাজ : বাংলাদেশের মানচিত্রে বন্যাপ্রবণ, জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং অতি খরাপ্রবণ অঞ্চল চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : ঢল বন্যা, বৃষ্টিজনিত বন্যা, নদীবাহিত বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যা, খরাপ্রবণ এলাকা।

চিত্র : মানচিত্রে বাংলাদেশের বন্যা, খরা ও জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ অঞ্চল

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কোনো স্থানের .... বছরের আবহাওয়ার গড়কে সে স্থানের জলবায়ু বলে।

২. বায়ুতে জলীয় .... পরিমাণকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে।

৩. বাংলাদেশে .... জলবায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বাংলাদেশের জলবায়ু	গ্রিনহাউস প্রভাব।
২. আবহাওয়া	বৃষ্টিপাত।
৩. জলবায়ু পরিবর্তন	আবহাওয়ার উপাদান।
৪. তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ইত্যাদি	সমভাবাপন্ন।
৫. বাংলাদেশের পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বৃদ্ধি পায়	দৈনিক পরিবর্তনশীল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশকে কয়টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল হিসাবে ভাগ করা হয়েছে?

২. বাংলাদেশে কয় ধরনের বন্যা হয়ে থাকে?

৩. বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের ধরন কেমন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জলবায়ুর উপাদানগুলো বর্ণনা কর।

২. কৃষিকাজে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব উল্লেখ কর।

৩. মানচিত্র এঁকে যেকোনো তিনটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল চিহ্নিত কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি আবহাওয়ার উপাদান?

ক. সমুদ্রস্রোত খ. সৌরবিকিরণ

গ. বারিপাত ঘ. ভূমির বন্ধুরতা

২. জলবায়ু-

i. ধীরে পরিবর্তনশীল

ii. মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত

iii. মাটির গুণাবলিতে প্রভাব ফেলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মৌটুসি তার মায়ের সাথে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখল তাদের জমিতে তার চাচা মসুর ডাল ও তিসির চাষ করেছে।

৩. মৌটুসি কোন ঋতুতে বেড়াতে গিয়েছে?

ক. বর্ষাকাল খ. গ্রীষ্মকাল

গ. শীতকাল ঘ. শরৎকাল

৪. ঐ সময়ে জলবায়ুর অবস্থা কেমন থাকবে?

ক. কম জলীয়বাষ্প ও বৃষ্টিহীন

খ. যথেষ্ট গরম ও প্রচুর বৃষ্টিপাত

গ. হঠাৎ ঝড় ও ঘূর্ণিঝড়

ঘ. সমুদ্রে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জয়ন্ত সেন তার বসতবাড়ির বাগানে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করেন। তার মেয়ে কোয়েল এ বছর চৈত্র মাসে শখ করে কিছু সরিষার বীজ বপন করে। বীজ অঙ্কুরিত হলেও কয়েক দিন পর চারাগুলো মরে যায়। কিন্তু তার বাবার লাগানো অন্যান্য শাকসবজি যেমন: চিচিঙ্গা, পটল খুবই ভালো উৎপাদন হয়। এ ব্যাপারে জয়ন্ত সেনের কাছে কোয়েল জানতে চাইলে তিনি বললেন, ফসল উৎপাদনের জন্য মৌসুম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা খুবই প্রয়োজন।

ক. জলবায়ু কাকে বলে?

খ. জমি চাষ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ব্যাখ্যা কর।

গ. কোয়েলের লাগানো চারাগুলো মরে যাওয়ার কারণ বর্ণনা কর।

ঘ. ফসল উৎপাদন সম্পর্কিত কোয়েলের বাবার মতামতটি বিশ্লেষণ কর।

২. সাদিয়া তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। মামার বাড়িটি শিল্প এলাকায় অবস্থিত। খুবই ঘনবসতিপূর্ণ ঐ এলাকায় বড় বড় বিল্ডিং আর গাড়ি ছাড়া তেমন কিছু নেই। প্রচণ্ড গরমে সে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। তার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে তার বাবা পরিবেশ বিশেষজ্ঞ আনোয়ার সাহেবের সাথে কথা বললে তিনি বললেন, ঐ এলাকার মানুষের অসচেতনতাই এর জন্য দায়ী।

ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কখন থাকে?
খ. বাতাসের আর্দ্রতাই বৃষ্টিপাতের কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. মামার বাড়িতে সাদিয়ার অস্বস্তিবোধ করার কারণ বর্ণনা কর।
ঘ. সাদিয়ার মামার এলাকাটিকে কীভাবে পরিবেশদূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় মতামত দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষিজ উৎপাদন

কৃষিজ উৎপাদন বলতে ফসল, গৃহপালিত পশু-পাখি এবং মাছ উৎপাদনকে বুঝায়। এই অধ্যায়ে উদ্যান ও মাঠ ফসল, গৃহপালিত পশু-পাখি এবং চাষযোগ্য মাছের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শাকসবজি উৎপাদন (লালশাক, টমেটো ও মরিচ), পাখি পালন (কবুতর) এবং মাছ চাষ (পাঙ্গাশ) পদ্ধতির কলাকৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।

চিত্র : টমেটো

চিত্র : কবুতর

চিত্র : মরিচ

চিত্র : পাঙ্গাশ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- উদ্যান ফসলের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- মাঠ ফসলের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- শাকসবজি উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- চাষযোগ্য মাছের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- মাছ চাষ পদ্ধতি (পাঙ্গাশ) বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশু-পাখির বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- পাখি পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- বসতবাড়ি কিংবা বাড়ির আঙ্গিনায় কৃষিজ দ্রব্য (শাকসবজি) উৎপাদন করতে পারব।
- কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে আগ্রহী হব।

পাঠ- ১ : উদ্যান ফসলের পরিচিতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মানুষ তার প্রয়োজনে যেসব উদ্ভিদ চাষ করে, তাদেরকে ফসল বলে। ফসলকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– উদ্যান ফসল এবং মাঠ ফসল। উদ্যান অর্থ বাগান। আমরা বসতবাড়ির আশেপাশে উঁচু জমিতে ফল, ফুল, শাকসবজি ইত্যাদি ফসলের বাগান করি। বাগানে যেসব ফসল ফলানো হয়, তাদেরকে উদ্যান ফসল (Garden crops) বলে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে মাঠেও উদ্যান ফসল চাষ করা হয়। উদ্যান ফসলকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১। ফল –আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কুল, বেল ইত্যাদি।
২। শাকসবজি- গোলআলু, বেগুন, টমেটো, শিম, লাউ, পালংশাক ইত্যাদি।
৩। মশলা – মরিচ, পেঁয়াজ, আদা, হলুদ ইত্যাদি।
৪। ফুল –গাঁদা, গোলাপ, জবা, টগর, বেলি, কসমস, ডালিয়া ইত্যাদি।
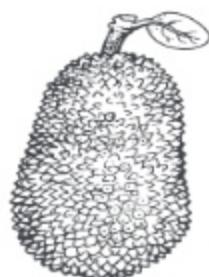
চিত্র : কাঁঠাল   চিত্র : আম   চিত্র : লিচু

চিত্র : ফুলকপি   চিত্র : রসুন   চিত্র : গোলাপ ফুল

কাজ : বাংলাদেশে জন্মে এমন ফল, শাকসবজি ও ফুলের তালিকা তৈরি কর।

উদ্যান ফসলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য ফসল থেকে এদেরকে আলাদা করেছে। উদ্যান ফসল স্বল্প পরিসরে নিবিড়ভাবে চাষাবাদ করা হয়। অর্থাৎ এসব ফসল চাষে একক জায়গায় অধিক পুঁজি ও শ্রম দরকার হয়। মানুষের খাদ্য, ঔষধ ও সৌন্দর্য তৃষ্ণা মেটানোর জন্য চাষ করা হয়। খাদ্যের জন্য চাষ করা উদ্যান ফসলে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বেশি থাকে। সচরাচর তাজা অবস্থায় খাওয়া হয় এবং বেশিরভাগ রসাল ও পচনশীল। এসব ফসলের বাহ্যিক চেহারা ও স্বাদ মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্যান ফসলের বৈশিষ্ট্যগুলো জানার পর আমরা নিশ্চয় উদ্যান ফসলের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারছি। অল্প জমিতে বেশি লাভ উদ্যান ফসলের প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। নিচের বিষয়গুলো থেকে উদ্যান ফসলের গুরুত্ব সহজে বুঝা যাবে।

১। **পুষ্টি ও পারিবারিক গুরুত্ব :** বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একজন ব্যক্তিকে দৈনিক ৪৫০ গ্রাম শাকসবজি ও ফল খাওয়া উচিত। বসতবাড়ির চারপাশে উদ্যান ফসল চাষ করে পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটানো যায়। বাড়তি ফসল বিক্রি করে পরিবারের আয়ও বাড়ানো যায়। অপরদিকে আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের গাছ থেকে দামি কাঠ পাওয়া যায়। এসব কাঠ ঘর-বাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কাঠ বিক্রি করে অনেক অর্থ পাওয়া যায়। তাছাড়া বিভিন্ন ফলদ ও সৌন্দর্যবর্ধনকারী বৃক্ষের ডালপালা ছাঁটাই করে প্রচুর জ্বালানি পাওয়া যায়। পরিবারের রান্নাবান্নার কাজে এসব জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। ফলে জ্বালানি খাতে অর্থ সাশ্রয় হয়।

২। **অর্থনৈতিক গুরুত্ব :** দেশে-বিদেশে উদ্যান ফসলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে আমরা শাকসবজি, ফল, ফুল ফসল থেকে বেশি লাভ করতে পারি। অন্যদিকে উদ্যান ফসল চাষাবাদে নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ প্রতিটি স্তরে অধিক পুঁজি, শ্রম ও প্রযুক্তির দরকার হয়। এতে করে সারা বছর কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে বেকার সমস্যা দূর করা যায়। তাছাড়া আম, আনারস, টমেটো, পেয়ারা, লিচু, আলু, কলা ইত্যাদি ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে জ্যাম, জেলি, আচার, জুস, সস, চিপস তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করা যায়। এসব তৈরির জন্য ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা যায়।

নতুন শব্দ : উদ্যান ফসল, মাঠ ফসল।

পাঠ- ২ : মাঠ ফসলের পরিচিতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আগের পাঠে আমরা উদ্যান ফসল সম্পর্কে জানতে পেরেছি, এ পাঠে আমরা মাঠ ফসল সম্পর্কে জানব। মাঠ ফসলকে ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ছয় ভাগ করা যায়, যথা–

১। দানা ফসল– ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি।

২। ডাল ফসল– মসুর, মুগ, ছোলা, খেসারি ইত্যাদি।

৩। তেল ফসল– সরিষা, তিল, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

৪। আঁশ ফসল– পাট, তুলা, মেস্তা ইত্যাদি।

৫। চিনি ফসল– আখ, সুগারবিট ইত্যাদি।

৬। পশুখাদ্য (Fodder crops) ফসল– ফেলন, গিনি, প্যারা, নেপিয়ার ইত্যাদি।

চিত্র : ধান

চিত্র : ছোলা

চিত্র : সূর্যমুখী

চিত্র : কার্পাস তুলা

চিত্র : সুগারবিট

চিত্র : নেপিয়ার ঘাস

মাঠ ফসলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা উদ্যান ফসল থেকে এদেরকে আলাদা করেছে। মাঠ ফসল বৃহত্তর পরিসরে চাষাবাদ করা হয়। উদ্যান ফসলের মতো নিবিড়ভাবে চাষাবাদের প্রয়োজন হয় না। মানুষ ও পশুর খাদ্যের জন্য চাষ করা হয়। দ্রুত পচনশীল নয়।

মাঠ ফসলের পরিচয় জানার পর, আমরা নিশ্চয় এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে অনুমান করতে পারছি। দানা, ডাল ও তেল ফসল আমাদের খাদ্যশস্য ফসল। দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা মানুষের প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ডাল জাতীয় ফসল আমাদের আমিষের চাহিদা মেটায়। বিভিন্ন তেল জাতীয় ফসল থেকে আমরা ভোজ্যতেল পাই।

গম, ভুট্টা ও ডাল ফসল পশু, পাখি ও মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য প্যারা, গিনি, নেপিয়ার, খেসারি চাষ করা হয়। এগুলো সবুজ অবস্থায় খাওয়ানো হয়। এর ফলে বাণিজ্যিকভাবে পশু, পাখি ও মাছ চাষ প্রসার লাভ করেছে।

আখ, সুগারবিট থেকে চিনি তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে আখচাষিরা চিনি কলে আখ সরবরাহ করে নগদ অর্থ পেয়ে থাকেন।

আঁশ ফসল থেকে সুতা, কাপড়, দড়ি, বস্তা, কার্পেট ইত্যাদি তৈরি হয়। আমাদের দেশে আঁশ ফসলের মধ্যে পাট অন্যতম। দেশে-বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি।

কাজ : এখানে বলা হয়নি এমন কয়েকটি মাঠ ফসলের নাম লেখ ও ব্যবহার উল্লেখ কর।

নতুন শব্দ : দানা ফসল, আঁশ ফসল, পশু খাদ্য ফসল।

পাঠ- ৩ : লালশাক উৎপাদন পদ্ধতি

আমাদের দেশে লালশাক একটি জনপ্রিয় শাক। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায় কম বেশি লালশাকের চাষ হয়। এতে প্রচুর ভিটামিন আছে।

মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতেই সারা বছর লালশাক আবাদ করা যায়। তবে দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি চাষের জন্য উত্তম। আমাদের দেশে শীতের শুরুতে লালশাকের ফলন বেশি হয়। গরমকালে উঁচু জমিতে লালশাক চাষ করা যায়।

চিত্র : লালশাক

জাত : লালশাকের অনেক জাত রয়েছে। তবে উন্নত দুটি জাত হলো- আলতাপাটি এবং বারি লালশাক-১। আলতাপাটি জাতটির পাতা ও কাণ্ড সিঁদুর লাল। বারি লালশাকের-১ পাতা ও কাণ্ড লাল হয়। এ শাকের ফুল লাল এবং বীজ গোলাকার হয়।

জমি তৈরি : লালশাকের বীজ খুব ছোট। তাই ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ঝুরঝুরা করে তৈরি করতে হবে। লালশাক একটি স্বল্পকালীন ফসল। তাই শেষ চাষের সময় প্রতি শতক জমিতে গোবর সার ৪০ কেজি, ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৭ দিন পর শতকপ্রতি ৪০০ গ্রাম অতিরিক্ত ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপন : লালশাকের বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে পরিচর্যা করা সুবিধাজনক এবং ফলনও বেশি হয়। বর্ষার সময় চাষ করলে এক মিটার চওড়া এবং ১৫ সেমি উঁচু বেড করে বীজ বপন করতে হয়। সেক্ষেত্রে দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি সেচ নালা রাখতে হয়। বপনের সময় বালির সাথে মিশিয়ে বপন করলে বীজ সব জায়গায় সমভাবে পড়তে পারে। প্রতি শতক জমিতে ১০ গ্রাম বীজ হলেই চলে। সারিতে বপন করলে, ২০ সেমি দূরে দূরে কাঠির সাহায্যে ১.৫-২.০ সেমি গভীর করে লাইন টেনে লাইনে বীজ ছিটিয়ে মাটি সমান করে দিতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : বীজ বপন বা চারা রোপণের পর থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত যেসব পরিচর্যা করা হয়, তাকে আন্তঃপরিচর্যা বলে। বপনের সময় মাটিতে বীজ গজানোর মতো পর্যাপ্ত রস অর্থাৎ জো থাকলে সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে জো না থাকলে বপনের পর পর জমিতে সেচ দিতে হবে। বীজ গজানোর এক সপ্তাহ পর প্রত্যেক সারিতে ৫ সেমি অন্তর গাছ রেখে অন্যান্য গাছ তুলে পাতলা করতে হবে। নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং সেচের পর মাটির চটা ভেঙে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে লালশাক সংগ্রহ শুরু করা যায়। প্রথম দিকে বড় গাছগুলো তুলতে হবে। এভাবে দুই-তিন দিন পর পর শাক তোলা যেতে পারে। শিকড়সহ লালশাকের গাছ তোলা হয়। তোলার পর পানিতে ধুয়ে আটি বেঁধে বাজারজাত করা হয়। কাণ্ড শক্ত হওয়ার আগেই শাকের জন্য ফসল সংগ্রহ শেষ করতে হবে।

ফলন : উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতি শতক জমি থেকে ৪৫-৫৫ কেজি লালশাক পাওয়া যায়।

> **কাজ :** পাঁচ শতক জমিতে লালশাক চাষের জন্য কী কী কৃষি উপকরণ প্রয়োজন হয়, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : উপরি প্রয়োগ, বেডে চাষ, মাটির জো, আন্তঃপরিচর্যা।

পাঠ- ৪ : মরিচ উৎপাদন পদ্ধতি

বাংলাদেশে মরিচ একটি মসলা ফসল। ঝালের জন্য কাঁচা ও পাকা মরিচ ব্যবহার করা হয়। কাঁচা মরিচে ভিটামিন 'সি' বেশি থাকে। বর্তমানে ঝালহীন এক ধরনের মরিচও পাওয়া যায়। একে কেপসিকাম মরিচ বলে। এই মরিচ সালাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জাত : বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মরিচের অনেক জাত ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন : বিন্দু, চল্লিশা, ধানী, উবদা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বগুড়া ইত্যাদি। এ ছাড়া বাংলা লঙ্কা (বারি মরিচ-১) নামের অনুমোদিত জাতটি সারা বছর চাষের উপযোগী।

চিত্র : ঝাল মরিচ

মাটি : পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত বেলে-দোআঁশ থেকে এঁটেল-দোআঁশ মাটিতে মরিচ ভালো হয়। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ বা পলি-দোআঁশ মাটি মরিচ চাষের জন্য উত্তম। মরিচগাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

চিত্র : কেপসিকাম মরিচ

রোপণ সময় : রবি মৌসুমে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। খরিপ মৌসুমে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বপন করা যায়। চারায় ৪-৫টি পাতা গজালে মাঠে রোপণের উপযুক্ত হয়।

বীজ হার, বপন ও রোপণ দূরত্ব : সরাসরি মূল জমিতে বীজ বপন করলে প্রতি শতক জমির জন্য ১২-১৬ গ্রাম বীজ লাগে। বীজতলায় চারা তৈরি করে লাগালে এর অর্ধেক বীজ লাগে। রবি মৌসুমে চারা এমনভাবে রাখতে হবে, যেন সারি থেকে সারি ২৫ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সেমি হয়। খরিপ মৌসুমে মূল জমিতে ৪৫×৪৫ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে।

বীজতলা তৈরি : সাধারণত রবি মৌসুমে সরাসরি মূল জমিতে বীজ বপন এবং খরিপ মৌসুমে প্রথমে বীজতলায় চারা তৈরি করে পরে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। বীজতলার আকার ৩ মিটার×১ মিটার (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) রাখা হয় এবং ১৫ সেমি উঁচু করা হয়। বীজতলার উপরের মাটি ১ঃ১ঃ১ অনুপাতে বালি, মাটি ও গোবর সার মিশিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। শোধনকৃত বীজ ৫ সেমি দূরে দূরে সারি করে ২-৩ সেমি গভীরে বপন করতে হয়। বীজকে পিঁপড়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য বীজতলার চারধারে সেভিন ডাস্ট ছিটিয়ে দিতে হবে। ৭-১০ দিনের মধ্যে চারা গজায়। বীজ বপনের পর অতিবৃষ্টি বা প্রখর রোদ থেকে রক্ষা পেতে পলিথিন বা খড়ের ছাউনি দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী বীজতলায় সকালে বা বিকালে হালকা সেচ দিতে হবে। চারায় ৪-৫টি পাতা গজালে মাঠে রোপণের উপযুক্ত হয়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ : ৪-৬টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। শেষ চাষের সময় শতকপ্রতি ৪০ কেজি গোবর সার, ১২০০ গ্রাম টিএসপি, ৫৪০ গ্রাম এমওপি, ৪৪০ গ্রাম জিপসাম সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অতঃপর সরাসরি বীজ বপন বা চারা রোপণের জন্য ১ মিটার চওড়া ও লম্বায় জমির আয়তন অনুসারে বেড তৈরি করতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য বেডগুলো ১৫ সেমি উঁচু এবং দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সার চারা রোপণের ২০, ৪০ ও ৬০ দিন পর ৩ বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবারে শতক প্রতি ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া সার গাছের গোড়া থেকে ১০-১৫ সেমি দূরে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। শীত ও খরার সময় সেচের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। সেচের কয়েক দিন পর মাটিতে চটা দেখা গেলে ভেঙে দিতে হবে।

কাজ : মরিচের বীজতলা সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি কর।

পাঠ- ৫ : মরিচের রোগ ও পোকামাকড় দমন

রোগ দমন : মরিচে চারা অবস্থায় ড্যাম্পিং অফ রোগ হতে পারে। এ রোগ দমনের জন্য এক কেজি বীজ ৩ গ্রাম প্রোভেক্সের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজতলা শুকনা রাখতে হবে। মরিচ গাছ অনেক সময় আগা থেকে গোড়ার দিকে ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে মারা যায়। একে ডাইব্যাক রোগ বলে। এ রোগ দমনের জন্য ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হয়। হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত গাছ দেখামাত্র তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাতের মরিচ চাষ করতে হবে।

চিত্র : মরিচের মড়ক রোগ

পোকামাকড় দমন : এক ধরনের ক্ষুদ্র মাকড়ের আক্রমণে চারা গাছের পাতা কুঁকড়িয়ে যায়। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম থিওভিট মিশিয়ে ১০ দিন পর পর স্প্রে করে মাকড় দমন করা যায়। থ্রিপস ও জাবপোকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ফসল সংগ্রহের সময় কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক ব্যবহার না করাই ভালো। ব্যবহার করলেও ৫-৭ দিন ফসল সংগ্রহ বন্ধ রাখা উচিত।

চিত্র : জাব পোকার বাচ্চা

ফসল সংগ্রহ : চারা রোপণের ৩০-৪০ দিন পর গাছে ফুল আসা শুরু হয়। কাঁচা মরিচ পরিপক্ব হতে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে। মরিচ পাকতে আরো ২৫-৩০ দিন সময় লাগে। কাঁচা মরিচ সপ্তাহে ২-৩ বার এবং পাকা মরিচ ১৫ দিন পর পর প্রায় ২-৩ মাস সংগ্রহ করতে হয়।

ফলন : জাতভেদে ফলনে তারতম্য হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে কাঁচা মরিচ উৎপাদন করলে গড়ে ৬-১০ টন ফলন পাওয়া যায়। তবে শুকনা মরিচ উৎপাদন করলে ১.৫-২.৫ টন ফলন হয়।

টবে মরিচ চাষ পদ্ধতি

এতক্ষণ আমরা মাঠে মরিচ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম। এখন আমরা টবে কীভাবে মরিচ চাষ করতে হয় সে সম্পর্কে জানব। টবে মরিচ চাষ করতে হলে প্রথমে ৬-১০ ইঞ্চি ব্যাসের মাটির বা প্লাস্টিকের টব নিতে হবে। টবের মাটি তৈরি করার জন্য দোআঁশ মাটি এক ভাগ, বেলে মাটি এক ভাগ এবং গোবর সার এক ভাগ নিয়ে ভালো ভাবে মেশাতে হবে। এবার টবের নিচের ছিদ্রের উপর হাঁড়ি বা কলসি বা ইটের টুকরো বসাতে হবে। যাতে অতিরিক্ত পানি চুইয়ে বের হয়ে যেতে পারে। মেশানো মাটি দিয়ে টব ভর্তি করতে হবে। প্রস্তুতকৃত টবে মরিচের চারা রোপণ করে হালকাভাবে ঝাঁঝরি দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে। সারা দিনে অন্তত ৬-৭ ঘণ্টা সূর্যের আলো পায় এমন জায়গায় টব বসাতে হবে। তবে চারা লাগানোর প্রথম কয়েক দিন টব দুপুরের সময় ছায়ায় রাখতে হবে।

চিত্র : ছিদ্রযুক্ত মাটির টব

চিত্র : টবসহ মরিচ গাছ

টবে মরিচ চাষের ক্ষেত্রে কম্পোস্ট বা গোবর সার ব্যবহার করাই ভালো। সারের অভাব হলে টবের উপরের মাটি সাদা হয়ে যায়, মাটিতে রসের অভাব দেখা যায়। এ রকম হলে নিড়ানি দিয়ে টবের মাটি আলগা করে সার মিশিয়ে দিতে হবে। টবে এমনভাবে পানিসেচ দিতে হবে, যেন পানি জমে না যায়। টবে ঘন ঘন পানিসেচ দিতে হয় বলে উপরের মাটি শক্ত হয়ে যায়। এ জন্য কয়েক দিন পর পর নিড়ানি দিয়ে আলগা করে দিতে হবে।

কাজ : টবে কী কী শাকসবজি চাষ করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ- ৬ : টমেটোর উৎপাদন পদ্ধতি

টমেটো ভিটামিন এ, বি এবং সি সমৃদ্ধ একটি সবজি । কাঁচা ও পাকা টমেটো রান্না এবং পাকা টমেটো সালাদ হিসাবে জনপ্রিয় । তাছাড়া পাকা টমেটো প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি সস রুচিবর্ধক । টমেটো মূলত শীতকালীন সবজি । তবে বর্তমানে গ্রীষ্মেও চাষ করা যায় ।

চিত্র : টমেটো গাছ

চিত্র : টমেটো সংগ্রহ

জাত : বাংলাদেশে টমেটোর অনেক অনুমোদিত জাত রয়েছে । শীতকালীন জাতের মধ্যে রয়েছে - বারি টমেটো-২ (রতন), বারি টমেটো-৯ (লালিমা), বারি টমেটো-১০ (অনুপমা), বিনা টমেটো-৩ এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা জাত মারগ্লোব, রুমা ভিএফ, অক্সহার্ট ইত্যাদি । গ্রীষ্মকালীন জাতের মধ্যে রয়েছে- বারি টমেটো-৪, বারি টমেটো-৫, বারি টমেটো-৯ (লালিমা), বারি টমেটো-১০ (অনুপমা), বারি টমেটো-১১ (ঝুমকা), বারি হাইব্রিড টমেটো-৩, বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ ইত্যাদি ।

মাটি : আলো-বাতাসযুক্ত উর্বর দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো । তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় বেলে-দোআঁশ থেকে এঁটেল-দোআঁশ সব মাটিতেই টমেটো ভালো জন্মে ।

চারা উৎপাদন পদ্ধতি : প্রতি হেক্টরে টমেটো চাষের জন্য ২০০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন । প্রথমে ৪টি বীজতলায় (৩ মিটার × ১ মিটার) ৫০ গ্রাম করে বীজ ঘন করে বুনতে হয়। বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পরে চারা তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় ৪×৪ সেমি দূরে দূরে রোপণ করতে হয় । সেক্ষেত্রে ২২টি বীজতলার প্রয়োজন হয় । এতে করে সবল চারা পাওয়া যায় । শীতকালীন জাতের জন্য সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ : ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে । মাটির প্রকৃতি ও স্থানভেদে ১ মিটার চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে । দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া সেচ নালা রাখতে হবে, যাতে পানিসেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা হয় । টমেটো চাষের জন্য সার প্রয়োগের পরিমাণ হচ্ছে–

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	২.০-২.৫ কেজি
টিএসপি	১.৫-২.০ কেজি
এমওপি	০.৮-১.২ কেজি
গোবর সার	৩০-৫০ কেজি

শেষ চাষের আগে সম্পূর্ণ গোবর, সব টিএসপি এবং তিন ভাগের দুই ভাগ এমওপি সার ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে চারা লাগানোর ১০ দিন, ২৫ দিন ও ৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। বাকি এমওপি সার দুই ভাগে ভাগ করে ২৫ দিন ও ৪০ দিন পর দিতে হবে।

চারা রোপণ : চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে রোপণের উপযোগী হয়। বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এজন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারা রোপণ করাই উত্তম। রোপণের পর হালকা সেচ দিতে হবে। এক মিটার চওড়া বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪০ সেমি রাখতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : জমিকে নিয়মিত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা রোপণের প্রথম ৩-৪ দিন হালকা সেচ দিতে হবে। পরবর্তীকালে মাটিতে রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে। সেচ অথবা বৃষ্টির কারণে জমিতে অতিরিক্ত পানি জমলে তা বের করে দিতে হবে। প্রথম ফুলের গোছার ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

কাজ : বসতবাড়ির আঙ্গিনায় কী কী শাকসবজি চাষ করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ- ৭ : টমেটোর রোগ ও পোকা দমন

ড্যাম্পিং অফ রোগ : ছত্রাকজনিত এ রোগে চারার গোড়ায় পানি ভেজা দাগ পড়ে ও পচে যায়। অনেক সময় শিকড় পচেও চারা মারা যায়। আক্রান্ত জায়গায় রিডোমিল গোল্ড দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

ঢলে পড়া রোগ : ব্যাকটেরিয়াজনিত এ রোগে গাছ যেকোনো সময় ঢলে পড়ে ও দ্রুত মারা যায়। আক্রান্ত গাছ দেখলেই তা তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে।

চিত্র : ঢলে পড়া রোগ

চিত্র : হলুদ পাতা কুঁকড়ানো রোগ

চিত্র : সাদা মাছি

হলুদ পাতা কুঁকড়ানো রোগ : ভাইরাসজনিত এ রোগে পাতা কিনারা থেকে মধ্যশিরার দিকে গুটিয়ে যায়। পাতা খসখসে হয়ে শিরাগুলো স্বচ্ছ হলুদ হয়ে কুঁকড়িয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের ডগায় ছোট ছোট পাতা গুচ্ছ আকার ধারণ করে। এ রোগ দমনের জন্য টমেটো ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখতে হবে, রোগমুক্ত চারা লাগাতে হবে, আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সাদা মাছি পোকা এ রোগের দ্রুত বিস্তার ঘটায়। মাছি পোকা দমনের জন্য ৭-১০ দিন পর পর এডমায়ার নামক কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : সাধারণত চারা রোপণের দুই মাস পর হতে টমেটো পাকা শুরু করে। জাতভেদে টমেটোর জীবনকাল ১২০-১৫০ দিন। ফল লালচে রং ধারণ করলে বোঁটা থেকে কেটে ফল সংগ্রহ করতে হয়। জাত ও মৌসুম ভেদে ফলনে পার্থক্য হয়। শীতকালে ২৫০ কেজি/শতক এবং গ্রীষ্মকালে ৮০-১০০ কেজি/শতক ফলন হয়ে থাকে।

কাজ : টবে বা বাড়ির আঙ্গিনায় টমেটোর চারা হাতেকলমে রোপণ করে, নিয়মিত পরিচর্যা করে অগ্রগতি শিক্ষককে জানাতে হবে।

পাঠ- ৮ : বাংলাদেশের চাষযোগ্য মাছের পরিচিতি

আমরা প্রতিদিন কোনো না কোনো মাছ খেয়ে থাকি। মাছ আমাদের খুবই প্রিয় খাদ্য। মাছ বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর, দিঘির স্বাদু পানিতে প্রাকৃতিকভাবে অনেক মাছ পাওয়া যায়। যেমন: রুই, কাতলা, মৃগেল, শিং, পুঁটি, খলিশা, কই, চিতল, বোয়াল, চিংড়ি প্রভৃতি। অন্যদিকে আমাদের লোনা পানির বিশাল বঙ্গোপসাগরেও আছে অনেক ধরনের মাছ। যেমন: ইলিশ, রূপচাঁদা, লইট্যা, কোরাল, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মাছ উৎপাদনের পরিমাণ মানুষের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের চাহিদা দিন দিন আরও বাড়ছে। আর তাই বেশি করে মাছ চাষের মাধ্যমে এ চাহিদা মেটানো সম্ভব।
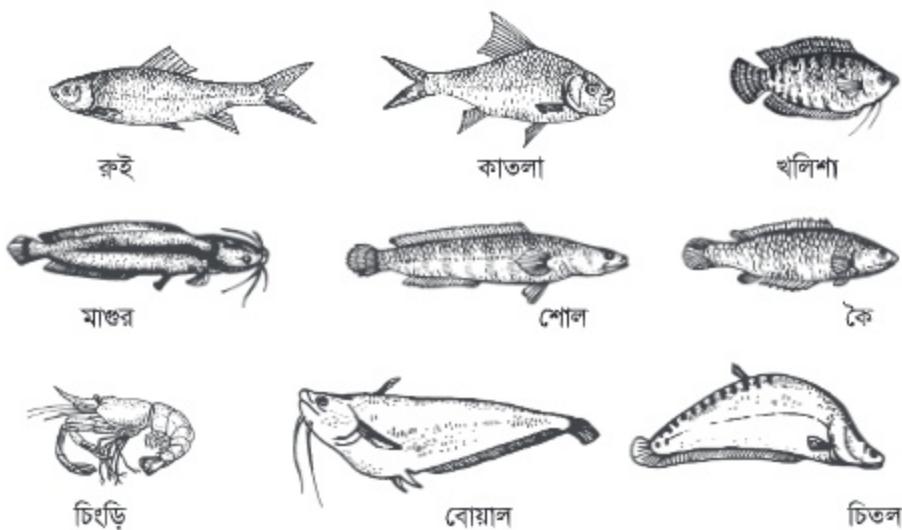
চিত্র : বাংলাদেশের কয়েকটি স্বাদু পানির মাছ
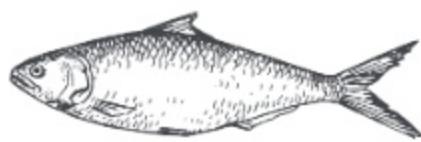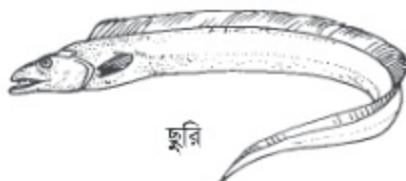
চিত্র : বাংলাদেশের কয়েকটি লোনা পানির মাছ

মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা ফুলকার সাহায্যে শ্বাস নেয় এবং লেজ ও পাখনার সাহায্যে চলাফেরা করে। মাছের দেহ মোটা এবং মাথা ও লেজের দিক সরু। তাই এরা সহজে ও দ্রুত পানিতে চলাফেরা করতে পারে। চিংড়ি একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী। চিংড়ি পানিতে বাস করে ও খেতে সুস্বাদু।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত মাছগুলোর মধ্যে সব মাছ আবার পুকুরে চাষ করা হয় না। দেশি চাষযোগ্য মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, গলদা ও বাগদা চিংড়ি উল্লেখযোগ্য। দেশি মাছ ছাড়াও চাষের উদ্দেশ্যে কিছু বিদেশি মাছও আমাদের দেশে আনা হয়েছে। এসব মাছ এককভাবে বা আমাদের দেশি চাষযোগ্য মাছের সাথে একত্রে পুকুরে মিশ্রচাষ করা যায়। বিদেশি চাষযোগ্য মাছের মধ্যে থাই পাঙ্গাশ, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, থাই সরপুটি, তেলাপিয়া অন্যতম।

কাজ : চাষযোগ্য মাছের তালিকা তৈরি কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : স্বাদুপানি, লোনা পানি, ফুলকা, মিশ্র চাষ ।

পাঠ- ৯ : বাংলাদেশের চাষযোগ্য মাছের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে পানিতে অনেক রকমের মাছ পাওয়া গেলেও সব মাছ পুকুরে চাষ করা যায় না। যে সকল মাছের পোনা সহজলভ্য, তাড়াতাড়ি বাড়ে, বাজারে চাহিদা ও ভালো দাম রয়েছে, পুষ্টিমান ভালো ও খেতে সুস্বাদু, সে সকল মাছই পুকুরে চাষ করা হয়। তাছাড়া এসব মাছ পুকুরের প্রাকৃতিক খাবার ও বাইরে থেকে দেওয়া সম্পূরক খাবার দক্ষতার সাথে হজম করতে পারে।

চিত্র : পুকুরে চাষযোগ্য কয়েকটি প্রধান মাছ

আমাদের দেশি কয়েকটি প্রধান চাষযোগ্য মাছ হলো রুই, কাতলা, মৃগেল। এরা সবাই নদীর মাছ। তবে পুকুরে চাষের জন্য খুব উপযোগী। প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও এরা সম্পূরক খাবার খায়। বর্ষাকালে স্রোতশীল নদীতে ডিম পাড়ে। তবে বর্তমানে চাষের উদ্দেশ্যে হ্যাচারিতে পোনা তৈরি করা হচ্ছে। নিচে এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো-

রুই : দেহ লম্বা আকৃতির। মাথা তুলনামুলক ছোট। ঠোঁট ফোলা ফোলা ও ঠোঁটের কিনারায় অনেক সূক্ষ্ম খাঁজ আছে। পিঠের দিক কিছুটা বাদামি। পেটের দিক হালকা সোনালি। বছরে ১ কেজি ওজনের হয়ে থাকে।

কাতলা : এদের মাথা বড়, দেহ চওড়া ও একটু চ্যাপটা। পিঠ উঁচু, মুখ উপরের দিকে বাঁকানো। এ মাছ বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ে। ঠিকমতো খাবার পেলে দুই বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত বড় হয়।

মৃগেল : মাথা দেহের তুলনায় ছোট। মুখ কিছুটা নিচের দিকে। দেহ লম্বাটে, নিচের অংশ লম্বালম্বিভাবে সোজা। মুখের দুই পাশে ছোট দুই জোড়া শুঁড় আছে।

পুকুরে চাষযোগ্য বিদেশি মাছের মধ্যে সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, তেলাপিয়া, থাই সরপুঁটি বর্তমানে

ব্যাপকভাবে চাষ করা হচ্ছে। নিচে এদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

সিলভার কার্প : এরা চীন ও রাশিয়ার নদীর মাছ। এদের মাথা ছোট, দেহের মাঝের অংশ চওড়া, সামনের ও পেছনের দিক সরু। আঁশ খুব ছোট। দেহের রং চকচকে রুপালি। এদের মুখ কাতলা মাছের মতো উপরের দিকে বাঁকানো। এ দেশের চাষযোগ্য মাছের সাথে পুকুরে চাষ করা যায়। পুকুরে চাষযোগ্য বিদেশি মাছের মধ্যে সিলভার কার্প সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে।

গ্রাসকার্প : এদেরও চীন এবং রাশিয়ার নদীতে পাওয়া যায়। এদের দেহ বেশ লম্বা, মাথা ছোট। দেহের রং সাদাটে ও পাখনা ছোট। এরা দ্রুত বাড়ে। চাষ অবস্থায় যেকোনো ঘাস বা লতাপাতা খাওয়ানো যায়।

তেলাপিয়া : থাইল্যান্ড থেকে এদের আনা হয়েছে। তেলাপিয়া বেশ খাটো এবং তুলনামূলকভাবে চওড়া আকৃতির। দেহ চ্যাপটা এবং রং ধূসর-নীলাভ। এরা দ্রুত বর্ধনশীল ও খেতে সুস্বাদু। এদের সাধারণত পুকুরে এককভাবে চাষ করা হয়। এরা ৩ - ৪ মাসেই খাবার উপযোগী হয়।

থাই সরপুঁটি : এ মাছকে রাজপুঁটিও বলা হয়। এ মাছের দেহের রং উজ্জ্বল রুপালি। দেহ বেশ চ্যাপটা। মাথা বেশ ছোট। এদের এককভাবে বা অন্য মাছের সাথে মিশ্রচাষ করা যায়। এরাও ৩-৪ মাসে খাবার উপযোগী হয়।

> **কাজ :** চাষযোগ্য কিছু মাছের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : সম্পূরক খাবার, হ্যাচারি।

পাঠ- ১০ : চাষযোগ্য মাছের পুষ্টি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মাছ চাষ করে আমরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারি। মাছ সকলের নিকট খুব প্রিয় খাদ্য। অন্যান্য খাবারের সাথে সকলের দৈনিক মাছ খাওয়া উচিত। মাছের বর্তমান উৎপাদন আমাদের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। তাই নিজেদের জলাশয়ে মাছ চাষ করে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে হবে। তাছাড়া অতিরিক্ত উৎপাদিত মাছ বাজারে বিক্রি করে নগদ অর্থ আয় করা যায়। আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কাজের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সামাজিক উন্নয়নে মাছ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

পুষ্টির চাহিদা পূরণ : আমাদের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ। এটি একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধের জন্য আমিষ দরকার। একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের দৈনিক ৩৩ থেকে ৬৬ গ্রাম আমিষ জাতীয় খাবারের প্রয়োজন হয়। আমিষের মধ্যে প্রাণিজ আমিষ উৎকৃষ্ট মানের। কিন্তু বর্তমানে আমরা প্রাণিজ আমিষের চাহিদার তুলনায় কম খেয়ে থাকি। মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে প্রাণিজ আমিষের অভাব দুর করা সম্ভব। তাই মাছ চাষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র : রুই মাছের কারি

চিত্র : তেলাপিয়া ফ্রাই

কাজ : পুষ্টির চাহিদা পূরণে মাছের গুরুত্ব সম্পর্কে দলগত কাজ করে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর ।

এ ছাড়াও মাছের তেল দেহের জন্য উপকারী । বিভিন্ন জাতের ছোট মাছ যেমন- মলা, ঢেলা, কাচকি মাছে প্রচুর ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায় । ভিটামিন 'এ' রাতকানা রোগ দূর করে । মাছের কাঁটায় প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায়, যা দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে ।

জীবিকার উৎস : বাংলাদেশে প্রায় ১২ মিলিয়ন মানুষ মাছ থেকে বিভিন্নভাবে জীবিকা নির্বাহ করে । যেমন- মাছ চাষ, মাছ ধরা, বিক্রয় ইত্যাদি । জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে । মাছ চাষের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব ।

চিত্র : জেলেরা মাছ ধরছে

চিত্র : বাজারে বিক্রেতা মাছ বিক্রি করছে

বৈদেশিক মুদ্রা আয় : মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে । মৎস্য সম্পদ রপ্তানি করে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়, তার শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগই আসে চিংড়ি থেকে । মাছ চাষ বৃদ্ধি করে এ আয় আরও বাড়ানো সম্ভব ।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : বাংলাদেশে অনেক পতিত পুকুর, ডোবা ও নালা রয়েছে, যেখানে মাছ চাষ করা হয় না । এসব জলাশয়ে মাছ চাষ করে গ্রামের গরিব ও স্বল্প আয়ের লোকেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

নতুন শব্দ : জলাশয়, আমিষ ।

পাঠ- ১১ : পাঙ্গাশ চাষের গুরুত্ব ও চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি

পাঙ্গাশ মানুষের খুবই প্রিয় ও সুস্বাদু একটি মাছ । একসময় আমাদের নদীতে পর্যাপ্ত পাঙ্গাশ পাওয়া যেত । কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে অন্যান্য মাছের মতো নদীতে পাঙ্গাশ মাছের প্রাপ্যতা কমে গেছে । বর্তমানে আমাদের দেশে থাইল্যান্ড থেকে আনা পাঙ্গাশ মাছ চাষ করা হচ্ছে । বাজারে এ মাছের প্রচুর চাহিদা রয়েছে ।

পাঙ্গাশ মাছের বৈশিষ্ট্য : মাছের উপরের অংশ ধূসর এবং পেটের অংশ সাদা হয় । এদের গায়ে কোনো আঁইশ থাকে না । দেহ চ্যাপটা, লম্বা আকৃতির, মাথা ছোট । পুকুরে চাষের জন্য খুবই উপযোগী । এ মাছে ছোট কাঁটা থাকে না । তাই খেতে খুব সুবিধা ।

চিত্র : পাঙ্গাশ মাছ

পাঙ্গাশ চাষের সুবিধা : যেকোনো ধরনের ছোট-বড় পুকুর, দিঘি, ডোবা ও বদ্ধ জলাশয়ে চাষ করা যায়। এ মাছ এককভাবে বা মিশ্রচাষও করা যায়। এ মাছ সর্বভুক বলে বিভিন্ন সম্পূরক খাবার সরবরাহ করে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। হ্যাচারি থেকে সহজে এ মাছের পোনা পাওয়া যায়। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও বেঁচে থাকার হার বেশি। তাই চাষে ঝুঁকি কম। এ মাছ অল্প পানির মধ্যে রেখে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়।

কাজ : পাঙ্গাশ চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে পোস্টার তৈরি কর এবং উপস্থাপন কর।
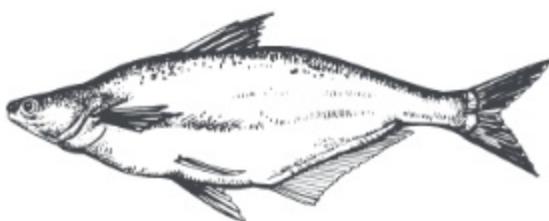
চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি : পুকুরে পোনা মাছ ছাড়ার আগে পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হয়। পুকুর প্রস্তুতির জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

১) পুকুরের পাড় মেরামত : প্রথমে পুকুরের পাড় মেরামত ও উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে। পুকুর পাড়ে ঝোপ-ঝাড় থাকলে কেটে ফেলতে হবে। বড় গাছ থাকলে তার ডালপালা কেটে দিতে হবে।

২) পুকুর পরিষ্কার : পুকুরে কোনো ধরনের জলজ আগাছা থাকবে না। পুকুরের তলায় বেশি কাদা মাটি থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে কাদার স্তর শুকিয়ে পুকুরের তলা শক্ত করতে হবে। এতে ক্ষতিকর গ্যাস ও রোগজীবাণু দূর হয়।

৩) রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ নিধন : পুকুরে রাক্ষুসে মাছ ও অপ্রয়োজনীয় মাছ রাখা যাবে না। সেচের মাধ্যমে পুকুর শুকিয়ে বা ঘন ফাঁসের জাল বারবার টেনে এ কাজ করা যেতে পারে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে ৩০ সেমি পানির গভীরতার জন্য প্রতি শতকে ৩০ - ৩৫ গ্রাম মাছ মারার বিষ রোটেনন পাউডার প্রয়োগ করে রাক্ষুসে মাছ মেরে ফেলতে হবে। রোটেনন দেওয়ার পর পুকুরের পানি ৭ - ১০ দিন ব্যবহার করা যাবে না। রোটেনন ব্যবহারে মৃত মাছ খাওয়া যাবে।

চিত্র : জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ ধরা হচ্ছে
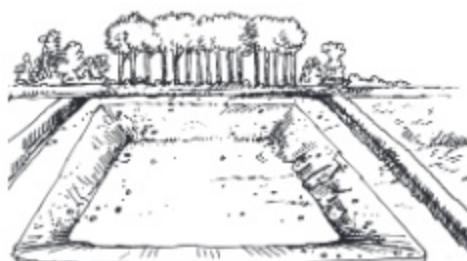
চিত্র : মাছ চাষের প্রস্তুতির জন্য শুকনা পুকুর

৪) চুন প্রয়োগ : উক্ত কাজগুলো শেষ হলে পুকুরের প্রতি শতকে ১ থেকে ২ কেজি করে চুন দিতে হবে। বালতি বা ড্রামে চুন নিয়ে গুলে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন পুকুরের পানি পরিষ্কার ও রোগজীবাণু দূর করে।

৫) পুকুরে সার প্রয়োগ : চুন দেওয়ার ৭ দিন পর পুকুরে শতক প্রতি ৫-৭ কেজি গোবর অথবা ২-৩ কেজি হাঁস মুরগির বিষ্ঠা, ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-১০০ গ্রাম টিএসপি সার পানিতে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের ৫-৬ দিন পর পুকুরের পানি সবুজ হলে বোঝা যাবে যে পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হয়েছে। তখন মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

নতুন শব্দ : মিশ্রচাষ, সম্পূরক খাদ্য, রাক্ষুসে মাছ, রোটেনন।

পাঠ-১২ : পাঙ্গাশের পোনা ছাড়া, চাষকালীন মাছের পরিচর্যা ও মাছ আহরণ

পোনা ছাড়া : পুকুরে পানির গভীরতা ১৫০-১৮০ সেমি হলে একক চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতকে ৭-১০ সেমি আকারের ১৩০-১৪০টি করে পাঙ্গাশ পোনা ছাড়তে হবে। মিশ্রচাষে শতকে ১২০-১২৫টি করে পোনার সাথে ৪-৫টি সিলভারকার্প বা কাতলার পোনা ছাড়া যেতে পারে। পুকুরে পোনা ছাড়ার পর মাছের যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ : পাঙ্গাশ একটি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ। তাই পাঙ্গাশ চাষের পুকুরে নির্দিষ্ট সময় পর পর খাদ্য প্রদান করতে হবে। বাজার থেকে কেনা সুষম খাদ্য পুকুরে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এতে উৎপাদন খরচ বেশি হয়। তাই বাজারজাত খাদ্য না কিনে এটি খামারেও বানানো যেতে পারে। নিচে পাঙ্গাশ মাছের জন্য ১০০ কেজি খাদ্য তৈরির উপকরণ দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ (কেজি)
১	শুঁটকি মাছের গুঁড়া	২৫
২	খৈল	৩০
৩	গমের ভুসি	২০
৪	চালের কুঁড়া	২০
৫	আটা	৩.৫০
৬	লবণ	১
৭	ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ	০.৫০
	মোট =	১০০ কেজি

প্রতিদিন পুকুরে মোট মাছের ওজনের শতকরা ৪-৬ ভাগ হিসাবে খাবার দিতে হবে। প্রতিদিনের খাবার ২ ভাগে ভাগ করে সকাল ও বিকালে দিতে হবে। তবে পোনা মাছকে একটু বেশি ও বড় মাছকে কম খাবার দিতে হয়।

২০২৫

মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা : পুকুরে পোনা ছাড়ার পর মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। প্রতি মাসে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে। রোগবালাই দমনে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের আগে পুকুরে শতকে প্রতি ২৫০ গ্রাম চুন ও ২৫০ গ্রাম লবণ সপ্তাহে একবার করে ৪-৬ সপ্তাহ দিতে হবে।
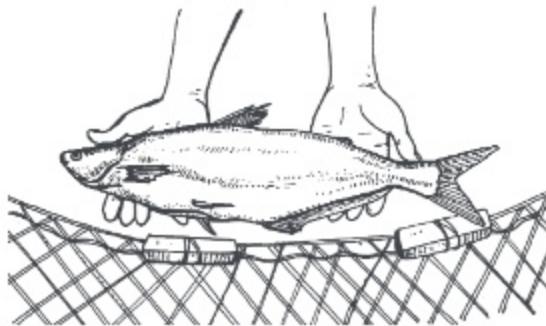
চিত্র : জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

চিত্র : পুকুর থেকে মাছ আহরণ

মাছ আহরণ ও বিক্রয় : পুকুরে পোনা ছাড়ার ৪ থেকে ৫ মাস পর মাছ গড়ে ৫০০ গ্রাম ওজনের হয়। তখন কিছু মাছ পুকুর থেকে উঠিয়ে বিক্রি করলে পুকুরে মাছের ঘনত্ব কমে যাবে। এতে পুকুরের অন্য মাছগুলো তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে।

কাজ : মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় করণীয় সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : মিশ্রচাষ, ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ।

পাঠ- ১৩ : গৃহপালিত পশুর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীতে অনেক পশু বাস করে। এদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, উট ইত্যাদি পশুকে গৃহে পোষ মানিয়ে লালন পালন করা যায় এবং এরা গৃহে বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তাই এদেরকে গৃহপালিত পশু বলা হয়। এদের মতো কুকুর, বিড়ালও গৃহপালিত পোষা প্রাণী। এরা সবাই আমাদের অনেক উপকারে আসে। বাংলাদেশে প্রায় ২৪ মিলিয়ন গরু ও ২৫ মিলিয়ন ছাগল রয়েছে। আমাদের দেশি গাভি দৈনিক গড়ে ১ লিটার দুধ দেয়। কিন্তু বিদেশি উন্নত জাতের গাভি দৈনিক ১৫-২০ লিটার দুধ দেয়। উন্নত জাতের দুগ্ধ উৎপাদনকারী গরুর মধ্যে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ও জার্সি অন্যতম।
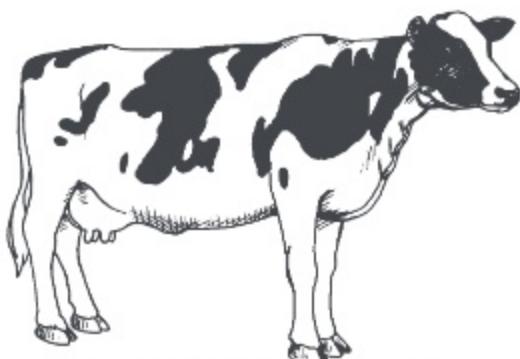
চিত্র : হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরু
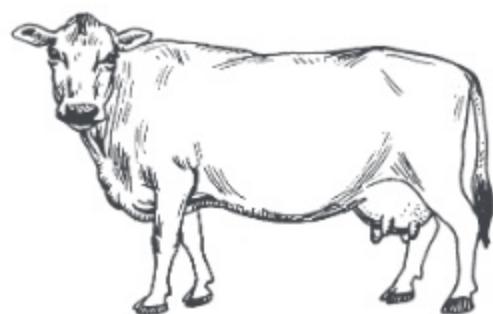
চিত্র : জার্সি জাতের গরু

চিত্র : ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল
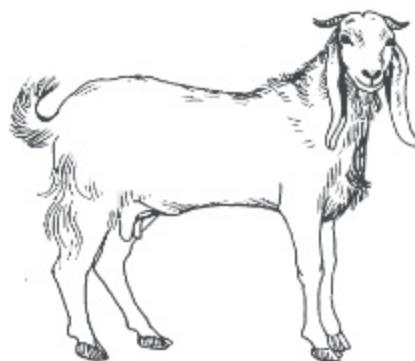
চিত্র : যমুনাপাড়ি বা রাম ছাগল জাতের ছাগল

শাহীওয়াল এবং রেড সিন্ধি গাভিও দৈনিক ৬-১০ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের সর্বত্র কালো রঙের যে ছাগল পালন করা হয়, তাকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বলা হয়। এটি মাংস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। তাছাড়া আমাদের দেশের মানুষ দুধের জন্য লম্বা পা ও ঝুলন্ত কানবিশিষ্ট যে ছাগল পালন করে, তাকে যমুনাপাড়ি বা রাম ছাগল বলা হয়।

গৃহপালিত পশু জন্মের দিন থেকে মানুষের আদর-যত্নে বড় হতে থাকে। এ কারণে গৃহপালিত প্রাণী ও মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গৃহপালিত পশুর ভিন্ন ভিন্ন আচরণ, বৈশিষ্ট্য থাকলেও এদের কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো :

১। গৃহপালিত পশু সহজে পোষ মানে।
২। বাড়ির পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
৩। গৃহপালিত পশু তার পালনকারীদের সহজে চেনে।
৪। এরা মানুষের সান্নিধ্য পছন্দ করে।
৫। এরা বাড়ির মানুষের আচরণে সাড়া দেয়।
৬। গৃহপালিত পশু বাড়িতে বাচ্চা প্রসব করে।
৭। এরা স্তন্যপায়ী হয়ে থাকে।

২০২৩
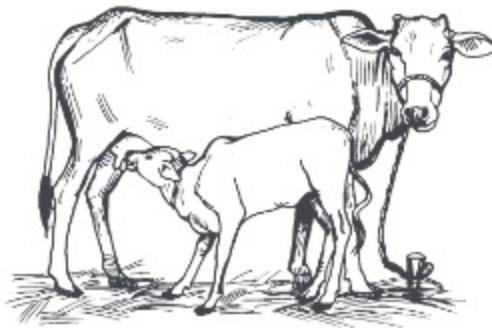
চিত্র : স্তন্যপায়ী বাছুর

চিত্র : গরুর বিভক্ত খুর

চিত্র : ঘোড়ার অবিভক্ত খুর

গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া জাবরকাটা প্রাণী। এদের খুর বিভক্ত ও মাথায় শিং রয়েছে। এরা জমিতে চরে ঘাস খায়। ঘোড়া জাবরকাটা প্রাণী নয়। এদের শিং নেই ও খুর বিভক্ত নয়। এরা দাঁড়িয়ে ঘুমায়। এরা দ্রুত দৌড়াতে পারে।

কাজ : গরু অথবা ছাগলের বৈশিষ্ট্য লিখ।

নতুন শব্দ : গৃহপালিত, জাবরকাটা ।

পাঠ- ১৪ : গৃহপালিত পাখির পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

গৃহপালিত পশুর মতো হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদিকে গৃহপালিত পাখি বলা হয়। কারণ, এদের পোষ মানিয়ে গৃহে লালনপালন করা যায়। এরা গৃহে ডিম পাড়ে এবং ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে থাকে। শিশু-কিশোররাও বড়দের মতো কবুতর, হাঁস ও মুরগি পালনে খুব আগ্রহ দেখায়। গ্রামবাংলার মানুষ প্রায় ২৪৬ মিলিয়ন দেশি মোরগ-মুরগি ও ৪৬ মিলিয়ন হাঁস লালনপালন করছে। আমাদের দেশি মুরগি বছরে গড়ে ৪৫টি এবং দেশি হাঁস ৭০টি ডিম পাড়ে। কিন্তু উন্নত জাতের লেগহর্ন, ফাওমি, আর আই আর জাতের মুরগি বছরে ২০০-২৫০টি ডিম পাড়ে। বিদেশি জাতের ইন্ডিয়ান রানার, খাকি ক্যাম্বেল ও জেন্ডিং হাঁস বছরে গড়ে ২৫০টি ডিম উৎপাদন করে। পিকিন হাঁস মাংসের জন্য বিখ্যাত।

চিত্র : খাকি ক্যাম্বেল হাঁস

চিত্র : হোয়াইট লেগহর্ন

চিত্র : লাহোরি কবুতর

গৃহপালিত পাখিরা বাড়িতে মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং তাদের জন্য তৈরি করা বিশেষ বাসস্থানে বসবাস করে। সকালে বাসা বা খাঁচা থেকে ছেড়ে দেবার পর এরা সারাদিন বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কবুতর খাদ্যের সন্ধানে অনেক দূর চলে যায় ও সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে আসে। গৃহপালিত পাখির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১। এরা সহজে পোষ মানে।
২। এরা বাড়ির পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়।
৩। এরা তার পালনকারীকে চেনে ও খাবারের জন্য পিছু নেয়।
৪। এরা গৃহে ডিম পাড়ে ও ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায়।
৫। এরা বাচ্চা পালনে দক্ষ।
৬। এরা নিজের খাবার নিজে সংগ্রহ করতে পারে।

চিত্র : মুরগির বাচ্চা পালন   চিত্র : মুরগির খাবার গ্রহণ

এদের পায়ে ৪টি আঙুল থাকে। এদের মাথায় লাল ঝুঁটি ও গলায় লাল ফুল থাকে। মুরগি ৫ মাস বয়সে ডিম দেওয়া শুরু করে। মুরগি তার সন্তানকে বন্য পশু-পাখির হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে।

হাঁসকে জলজ পাখি বলা হয়। হাঁসের পায়ের আঙুল পর্দা দ্বারা যুক্ত। তাই এরা সহজে পানিতে সাঁতার কাটতে পারে। হাঁসের ডিমে তা দেবার অভ্যাস কম। তাই হাঁসের ডিম মুরগির নিচে রেখে ফুটানো হয়।

কাজ : মুরগি বা হাঁসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ কর।

নতুন শব্দ : ঝুঁটি, জলজ পাখি।

পাঠ- ১৫ : গৃহপালিত পশু-পাখির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

গৃহপালিত পশু-পাখি লালনপালন করে আমরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারি। গৃহপালিত অধিকাংশ পশু-পাখির মাংস ও ডিম মানুষের নিকট খুব জনপ্রিয়। মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও মেধা-মনন বিকাশের জন্য অন্যান্য খাবারের সাথে দৈনিক দুধ, ডিম ও মাংস খাওয়া আবশ্যক। গরুর দুধ সুষম খাদ্য। হাঁস-মুরগির ডিমও একটি পুষ্টিকর খাবার। এসব পুষ্টিকর খাবার আমাদের শরীরের আমিষের ঘাটতি পূরণ করে থাকে। তাই প্রতিদিনের খাবারে দুধ ও ডিম থাকা উচিত। মাংস, ডিম, দুধ, মিষ্টি, দই ইত্যাদি অতিথি আপ্যায়নে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র : হাঁস-মুরগির ডিম
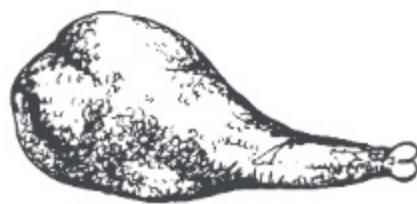
চিত্র : গরুর মাংস

বাংলাদেশে দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। বাজারে গৃহপালিত পশু-পাখি এবং এদের থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ও দাম দুটোই বেশি। তাই আমাদের গৃহপালিত পশু-পাখির পারিবারিক খামার করা দরকার। এতে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে। খামারের অতিরিক্ত উৎপাদিত ডিম ও দুধ বাজারে বিক্রি করে অর্থ আয় করা যাবে।

চিত্র : দুধ

গরু ও মহিষ জমি চাষ, পরিবহন, শস্য মাড়াই, ঘানিটানা এবং শস্য নিড়ানির কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গৃহপালিত পশু-পাখি আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। কৃষি-জমির আগাছা, ফসলের উপজাত, রান্না ঘরের বর্জ্য এদের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হাঁস-মুরগি পোকামাকড় ও ঝরে পড়া দানা শস্য খেয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। ভেড়ার পশম শীতবস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

কুকুর বিশ্বস্ত পোষা প্রাণী হওয়ায় পৃথিবীর সব দেশেই প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত হয়। দাঙ্গা দমনে নিরাপত্তা বাহিনী ঘোড়া ব্যবহার করে। উট, ঘোড়া, গাধাসহ অনেক পশু ভার বহন কাজে ব্যবহৃত হয়।
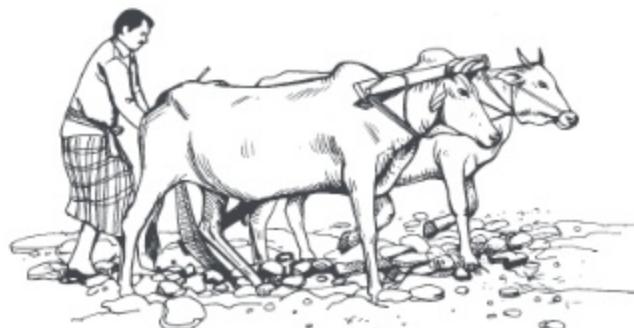
চিত্র : গরু দিয়ে জমি চাষ

চিত্র : পরিবহনে ঘোড়া

চিত্র : গরু দিয়ে শস্য মাড়াই

গরুর গোবর ও হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা জৈবসার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এগুলো মাছের খাদ্য তৈরিতে ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

কাজ : গৃহপালিত পশু অথবা পাখি আমাদের কী কী উপকারে আসে তা দলগত আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : সুষম খাদ্য, পারিবারিক খামার, ঘানিটানা, উপজাত।

পাঠ-১৬ : কবুতরের পরিচিতি ও পালন পদ্ধতি

কবুতর আমাদের অতিপরিচিত গৃহপালিত পাখি। বাংলাদেশের গ্রামে এমনকি শহর এলাকায়ও অনেককে কবুতর পালন করতে দেখা যায়। আমরা সাধারণত গৃহপালিত পাখির ডিম ও মাংস উভয়ই খেয়ে থাকি। কিন্তু কবুতরের ডিম খাওয়া হয় না, শুধু মাংস খাওয়া হয়। বিশেষ করে ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা কবুতরের মাংস খাওয়া হয়। কবুতরের মাংস খুব নরম।
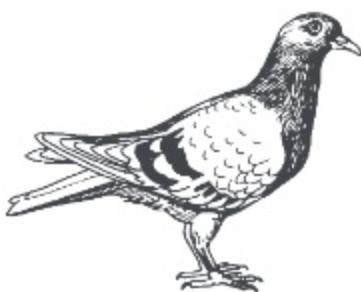
চিত্র : জালালি কবুতর চিত্র : হোয়াইট কিং কবুতর চিত্র : হোমার জাতের কবুতর

পৃথিবীতে অনেক জাতের কুবতর রয়েছে। মাংস উৎপাদনের জন্য হোয়াইট কিং, সিলভার কিং, কারনাউ ও হোমার বিশ্ববিখ্যাত। চিত্তবিনোদনের জন্য লাহোরি, ফ্যানটেইল, সিরাজি, গিরিবাজ, ময়ূরপঙ্খি ইত্যাদি জাতের কবুতর রয়েছে। দেশি কবুতরের মধ্যে জালালি, গোলা, গোলি, ডাউকা, লোটন, মুক্কি ইত্যাদি জাত দেখা যায়।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক কবুতরের খামার তেমন দেখা যায় না। এ দেশে অনেকে চিত্তবিনোদন ও শখের বশে কবুতর পালন করে থাকে। এতে চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি কবুতরের বাচ্চা তাদের পারিবারিক মাংসের চাহিদা পূরণ করে।

চিত্র : ফ্যানটেইল জাতের কবুতর

চিত্র : লাহোরি জাতের কবুতর

চিত্র : টাম্বলার জাতের কবুতর
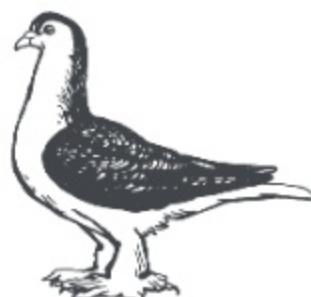
একটি পুরুষ ও স্ত্রী কবুতর জোড়ায় জোড়ায় বসবাস করে। কবুতর ৫-৬ মাস বয়সে ২৮ দিন অন্তর ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে দুইটি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সময় হলে এরা উভয়ই খড়-কুটা টেনে বাসায় তোলে। ডিম পাড়ার পর উভয়ই পালাক্রমে ডিমে তা দেয়। কবুতরের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে ১৮ দিন সময় লাগে।

কবুতর পালন খুব আনন্দদায়ক। কবুতরের মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। কবুতর থেকে বছরে ৭-৮ জোড়া বাচ্চা পাওয়া যায়। কবুতরের বাচ্চা ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেই খাবার উপযোগী হয়। কবুতর পালনে খরচ কম। স্বল্প পুঁজিতে কবুতর পালন করা যায়। এদের রোগবালাই কম হয়।

কাজ : বিভিন্ন জাতের কবুতরের নামের তালিকা তৈরি কর।

১০১৮

বহুকাল আগে থেকে মানুষ মুক্ত পদ্ধতিতে কবুতর পালন করে আসছে। কিন্তু বর্তমানে অনেকে অর্ধ-আবদ্ধ ও আবদ্ধ পদ্ধতিতে কবুতর পালন করছে। আমাদের দেশে সাধারণত মুক্ত অবস্থায় কবুতর পালন করা হয়। আবার অনেককে তারের জাল দিয়ে ঘিরে অথবা বড় আবদ্ধ ঘরে কবুতর পালন করতে দেখা যায়।

মুক্ত পদ্ধতিতে পালন : সকালে কবুতরকে বাসা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দিনের বেলায় খাদ্যের খোঁজে এরা বিভিন্ন জায়গায় উড়ে বেড়ায়। মাঝেমধ্যে বাড়ি এসে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলে যায়। তবে সন্ধ্যার আগেই এরা বাড়ি চলে আসে। এ অবস্থায় সাধারণত কবুতরকে কোনো খাদ্য সরবরাহ করা হয় না। কিন্তু কবুতর সবসময় মাঠ থেকে পরিমাণ মতো খাবার পায় না। তাই মুক্ত পদ্ধতিতে পালন করা কবুতরকে বাড়িতে নিয়মিত কিছু খাবার সরবরাহ করলে ভালো বাচ্চা পাওয়া যায়।

চিত্র : মুক্ত পদ্ধতিতে কবুতরের বাসা

চিত্র : আবদ্ধ পদ্ধতিতে ঘরে কবুতরের খোপ
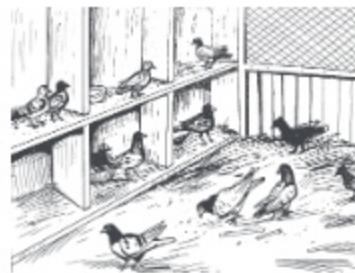
আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন : আবদ্ধ অবস্থায় বড় ঘরের মধ্যে কবুতর পালন করা হয়। এ অবস্থায় কবুতরের ঘরে যেন প্রচুর আলো-বাতাস ঢুকতে পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এখানে ঘরের মধ্যে কবুতরকে বাসা বা খোপ তৈরি করে দেওয়া হয়। তাছাড়া ঘরের মধ্যে কবুতরের জন্য খাদ্য ও পানির পাত্রের ব্যবস্থা করতে হয়। বৃষ্টির পানি যাতে ঘরে না আসে, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। ঘরের মধ্যে কবুতর যাতে উড়তে পারে, সেদিকে লক্ষ রেখে বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তবে যে পদ্ধতিতেই কবুতর পালন করা হোক না কেন, খড়-কুটা টেনে বাসায় তোলা, ডিম পাড়া এবং ডিমে তা দেওয়ার সময় এদের বিরক্ত করা যাবে না।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন : অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় কবুতর পালন করলে বহুতল বাসা তৈরিতে খরচ কম হয়। কবুতরকে হিসাব করে অর্ধেক খাবার বাড়িতে সরবরাহ করতে হয়। অবশিষ্ট খাদ্য এরা মুক্ত অবস্থার মতো নিজেরা সংগ্রহ করে খায়।

নতুন শব্দ পরিচিতি : মুক্ত পদ্ধতি, আবদ্ধ পদ্ধতি, অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি, বহুতল, প্যাকিং কাঠ।

পাঠ-১৭ : কবুতরের বাসস্থান ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

কবুতরের বাসস্থান : কবুতর একক বাসা বা খোপের মধ্যে বসবাস করতে পছন্দ করে। কবুতরের বাসা মাটি থেকে উঁচুতে স্থাপন করতে হয়। বন্য পশু-পাখি যাতে এদের ক্ষতি করতে না পারে, সে দিকে লক্ষ রেখে বাসা তৈরি করতে হয়। কাঠ, পাতলা টিন, বাঁশ বা প্যাকিং কাঠ দিয়ে কবুতরের বাসা বা খোপ তৈরি করা হয়। কবুতর থেকে বেশি বাচ্চা পেতে হলে এক জোড়ার জন্য পাশাপাশি ২টি বাসা তৈরি করতে হবে। কারণ বাচ্চা পালনের সময় আবার ডিম পাড়ার সময় হলে সে বাচ্চার পাশের বাসায় নতুন করে ডিম দেয় এবং তা দিতে শুরু করে। কবুতরের ঘর দুই বা ততোধিক তলা বিশিষ্টও হতে পারে। বহুতল বাসা তৈরিতে খরচ কম হয়।
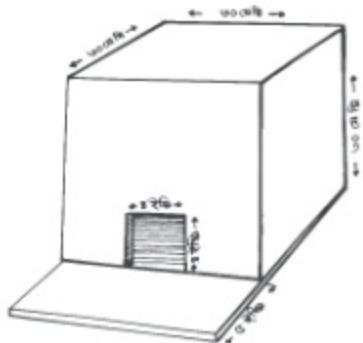
চিত্র : কবুতরের একক খোপ
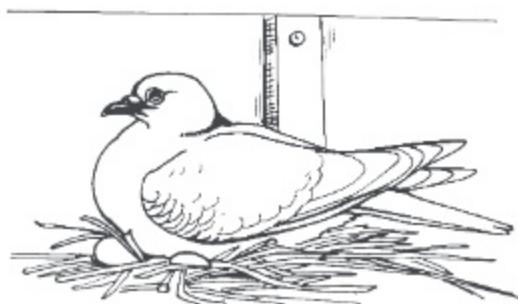
চিত্র : খোপে কবুতর ডিমে তা দিচ্ছে

স্ত্রী ও পুরুষ কবুতর উভয়ই পালাক্রমে বাচ্চাকে খাওয়ায়। এরা বাচ্চার মুখের ভিতর ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে আদরের সাথে নিজ খাদ্যথলির রসমিশ্রিত নরম খাদ্য বাচ্চার মুখের ভিতর দেয়। এ রসমিশ্রিত নরম খাদ্য অত্যন্ত পুষ্টিকর হওয়ায় তা খেয়ে বাচ্চা দ্রুত বেড়ে উঠে। ২৮ দিন পর এদের পাখার পালক গজায় এবং এরা ঠোঁট দিয়ে তুলে খেতে পারে।

চিত্র : কবুতর তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে

বয়স্ক কবুতরের খাদ্য : কবুতর ধান, গম, ভুট্টা, মটর, খেসারি, সরিষা, কলাই ইত্যাদি শস্যদানা খেতে পছন্দ করে। মুরগির জন্য তৈরি সুষম খাবারও কবুতরকে খাওয়ানো যায়। প্রতিটি কবুতর গড়ে দৈনিক ৫০ গ্রাম খাবার খেয়ে থাকে। কবুতরকে ঝিনুকের খোসাচূর্ণ, চুনাপাথর, কাঠকয়লা চূর্ণ, লবণ ইত্যাদি একত্রে মিশিয়ে খেতে দিতে হয়। এতে তাদের খনিজ লবণের অভাব পূরণ হয়। কবুতরের খাদ্য ও পানি পাত্রে সরবরাহ করতে হয়। মুক্ত ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে কবুতর নিজেই খাদ্যের সন্ধানে বের হয়ে যায়। এরা বিভিন্ন ফসলের মাঠ হতে খাদ্য খেয়ে থাকে। ঘরে কবুতরকে তৈরি খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

পানি সরবরাহ : কবুতরের পানি পান ও গোসল করার জন্য ঘরের মাঝখানে ২-৩টি গামলার ব্যবস্থা করতে হবে। গামলার ৩-৪ ভাগ পানি দিয়ে ভরে রাখতে হবে। এখান থেকেই এরা পানি পান ও গোসল করবে।

চিত্র : কবুতর মাঠে খাবার খাচ্ছে

চিত্র : কবুতর ঘরে দেওয়া খাবার খাচ্ছে

কবুতরের খাদ্য তালিকা-

কবুতরের খাদ্য উপাদান	শতকরা হার (%)
গম	৩০.০
ভুট্টা	২০.০
সরিষা দানা	১৫.০
খেসারি	২০.০
কলাই	১৪.৫
লবণ	০.৫
মোট	১০০

কাজ : কবুতরের বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের নাম লেখ এবং একটি খাদ্য তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : খাদ্যথলি, শস্যদানা, চুনাপাথর।

২০২৩

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ধান, মসুর, পাট, সরিষা, আখ হলো .... ফসল ।

২. অল্প জমিতে বেশি লাভ হলো .... ফসলের প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ।

৩. রোটেনন দেওয়ার পর পুকুরের পানি .... দিন ব্যবহার করা যাবে না ।

৪. স্ত্রী ও পুরুষ কবুতর উভয়ই পালাক্রমে .... খাওয়ায় ।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ		ডান পাশ
১.	মরিচ	আমিষ ।
২.	পাট, তুলা	পশম ।
৩.	ডাল ফসল	মসলা ।
৪.	লালশাক	সুতা, কাপড় ।
৫.	ভেড়া	স্বল্পকালীন ফসল ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন মাছকে রাক্ষুসে মাছ বলা হয়?

২. কোন গৃহপালিত পাখিকে জলজ পাখি বলা হয়?

৩. কবুতরের ডিম কত দিনে ফোটে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মাছ চাষের জন্য পুকুরে কেন চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন তা লেখ ।

২. গৃহপালিত পশুর দুইটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ ।

৩. 'স্বল্প পুঁজিতে কবুতর পালন করা যায়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি স্বাদু পানির মাছ?

ক. ছুরি খ. শোল

গ. ইলিশ ঘ. ভেটকি

২. পুকুরের তলার কাদার স্তর শুকালে-

i. ক্ষতিকর গ্যাস দূর হয়
ii. রোগজীবাণু দূর হয়
iii. প্রাকৃতিক খাবার বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. মাংসের জন্য বিখ্যাত কোন হাঁস?

ক. পিকিন খ. ইন্ডিয়ান রানার
গ. খাকি ক্যাম্বেল ঘ. জেন্ডিং

৪. পশুর খাদ্য (Fodder Crops) হচ্ছে-

i. গম, ভুট্টা
ii. ফেলন, গিনি
iii. ফেলন, নেপিয়ার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আলেয়া বেগম বাড়ির পাশেই তার ৫ শতক জমিতে মরিচের চাষাবাদ করলেন। গাছগুলো যথাযথ বৃদ্ধি পেল। ফসল সংগ্রহের সময় জাব পোকার আক্রমণ হওয়ায় তিনি তাৎক্ষণিক কীটনাশক স্প্রে করলেন।

৫. আলেয়া বেগমের জমিতে কী পরিমাণ গোবর সার লেগেছিল?

ক. ১২০ কেজি খ. ১৬০ কেজি
গ. ২০০ কেজি ঘ. ২৪০ কেজি

৬. আলেয়া বেগমের তাৎক্ষণিক কীটনাশক স্প্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে?

ক. সালোক সংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হবে খ. ফসলের মান বৃদ্ধি পাবে
গ. ফসল সংগ্রহ বিলম্ব হবে ঘ. প্রস্বেদন বাধাগ্রস্ত হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রওশন আরা বসতবাড়ির সাথে খালি জায়গায় বিভিন্ন শাকসবজি চাষের সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩ শতাংশের ১টি প্লট টমেটো চাষের জন্য প্রস্তুত করেন। উন্নত জাত, সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ, যত্ন ও পরিচর্যার কারণে রওশন আরা টমেটোর সর্বোচ্চ ফলন পান। পারিবারিক প্রয়োজন মিটিয়ে তিনি কিছু টমেটো বাজারে বিক্রি করেন। রওশন আরার উদ্যোগটি দেখে আশেপাশের অনেকেই বসতবাড়িতে শাকসবজি বাগান করেন।

ক. উদ্যান ফসল কাকে বলে?
খ. লালশাকের বীজ বপন করতে বীজের সাথে বালি বা ছাই মেশানো হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. রওশন আরা টমেটো চাষের জন্য ৩ শতাংশ জমিতে কতটুকু গোবর সার প্রয়োগ করেছিলেন তা নির্ণয় কর।
ঘ. রওশন আরার উদ্যোগটি পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণে কী ধরনের ভূমিকা রাখবে ? বিশ্লেষণ কর।

২. মনোয়ারা বেগম স্বামীর আয়ে সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খান। তার বাড়িতে একটি পতিত জলাশয় ও কিছু খোলা উঁচু জায়গা আছে। তিনি প্রতিবেশীর পরামর্শক্রমে পতিত জলাশয়ে পাঙ্গাশ মাছ চাষ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে খোলা উঁচু জায়গাটিও তিনি চাষাবাদের আওতায় আনার পরিকল্পনা করলেন।

ক. চাষযোগ্য মাছ কাকে বলে?
খ. মাছ চাষের একটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
গ. মনোয়ারা বেগমের উক্ত মাছটি চাষের জন্য বাছাই করার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মনোয়ারা বেগমের পরবর্তী পরিকল্পনাটি কীভাবে তার সংসারে আয় বাড়াতে সহায়তা করবে? বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বনায়ন

লতা, গুল্ম ও ছোটবড় গাছপালায় আচ্ছাদিত এলাকাকে বন বলা হয় । বনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে উঁচু ও কাষ্ঠল বৃক্ষ থাকবে । বনে নানারকম পশু-পাখি ও পোকামাকড় বাস করে বনজ পরিবেশ তৈরি করে। বন আমাদের পরিবেশকে আবাস উপযোগী রাখে। কোনো দেশের সমগ্র এলাকার ২৫% প্রাকৃতিক বন থাকাটা আদর্শ অবস্থা। সরকারি হিসাব মতে, বাংলাদেশের ১৭% এলাকায় প্রাকৃতিক বন রয়েছে। বনকে রক্ষা করা ও নতুন বন সৃষ্টি করা এখন সময়ের দাবি। এ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক বন, সামাজিক বন ও কৃষি বন সৃষ্টি এবং এর পরিচর্যা সম্পর্কে আমরা জানব। তাছাড়া বনের গুরুত্ব সম্পর্কেও আমরা তথ্য জানতে এবং উপলব্ধি করতে পারব ।

চিত্র : সুন্দরবন

চিত্র : কৃষিবন

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- কৃষি ও সামাজিক বনের সাথে প্রাকৃতিক বনের তুলনা করতে পারব ।
- বাংলাদেশের মানচিত্রে প্রাকৃতিক বন চিহ্নিত করতে এবং ঐ সকল বনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা তৈরি করতে পারব ।
- কৃষি ও সামাজিক বনায়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব ।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, কৃষি ও সামাজিক বনায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- বসতবাড়ির আঙ্গিনায়, ছাদে, টবে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার উপায় বর্ণনা করতে পারব ।
- বসতবাড়ির আঙ্গিনায়, ছাদে, টবে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করতে পারব ।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কৃষি ও সামাজিক বনায়নের অবদান তুলে ধরে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কৃষি ও সামাজিক বনায়নের অবদান উপলব্ধি করতে পারব ।

পাঠ-১ : প্রাকৃতিক বন, সামাজিক বন ও কৃষি বন

গাছপালায় ঢাকা বিস্তৃত এলাকাকে বন বলা হয়। বনে বড় বড় উদ্ভিদের সংখ্যা বেশি থাকে। এ ছাড়া মাঝারি গাছপালা ও লতা-গুল্মও বনে জন্মে থাকে। হরেক রকমের পশু-পাখি এবং কীটপতঙ্গ বনে বাস করে। এসব গাছপালা ও জীবজন্তু এক সাথে মিলেমিশে বনজ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বনের প্রকারভেদ

উৎপত্তি অনুসারে বন প্রধানত তিন প্রকার, যথা- ক) প্রাকৃতিক বন খ) সামাজিক বন ও গ) কৃষি বন

প্রাকৃতিক বন

প্রকৃতিতে আপনা-আপনি যে বিস্তৃত বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়, তাকে প্রাকৃতিক বন বলে। শত শত বছর ধরে এ বনাঞ্চল গড়ে ওঠে। সুন্দরবন এরকম একটি প্রাকৃতিক বন। খুলনা শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে এ বন অবস্থিত। বৃহত্তর ঢাকার গাজীপুর ও মধুপুরের শালবনও প্রাকৃতিক বন। আমাদের দেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রাকৃতিক বন রয়েছে। এসব বনের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হলো- সুন্দরি, শাল, গর্জন, গেওয়া, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি। অঞ্চল ভেদে হাতি, বাঘ, হরিণ, বানর, ভালুক, অজগর এবং বিভিন্ন রকম পাখি ও পোকামাকড় এসব বনে বাস করে। এসব বন থেকে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাকৃতিক বন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিস্তৃতি অনুসারে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বন তিন প্রকার। এগুলো হলো- পাহাড়ি বন, সমভূমির বন ও উপকূলীয় বন।

কাজ :
১. সুন্দরবনকে প্রাকৃতিক বন বলা হয় কেন?
২. শালবন কোথায় অবস্থিত?
৩. প্রাকৃতিক বনের পাঁচটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম লেখ।
৪. প্রাকৃতিক বন আমাদের কী উপকার করে?

সামাজিক বন

বাড়িঘর, বিদ্যালয়, পুকুরপাড়, রাস্তা ও বাঁধের দুই পাশে আমরা বিভিন্ন রকম গাছপালা রোপণ করে থাকি। এসব উদ্ভিদের বেশিরভাগই ফল জাতীয় হয়। আবার রেইনট্রি, মেহগনি, কড়ই জাতীয় বনজ গাছও লাগানো হয়। এসব গাছপালা আমাদের চারপাশে ছায়াঘন প্রশান্তিময় সবুজ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ বন বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ থেকে আমাদের রক্ষা করে, আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। মানুষ নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পনা করে যে বন সৃষ্টি করে, তাকে সামাজিক বন বলে। পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ভোলা এবং চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে মানব তৈরি উপকূলীয় বন সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ কেওড়া ও বাইন। বিভিন্ন পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদিও মানুষ বিনোদন ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করে গড়ে তোলে। এগুলোও সামাজিক বনের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি বন

আমাদের দেশের অনেক বাড়িতে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় বড় গাছপালার সাথে সবজি চাষ করা হয়। ফলের বাগানে ও ফসলি জমির আইল, ক্ষেত-খামারে পৌঁছার পথ, পুকুরের চারপাশ, খাল-সেচনালার পাশে ছোট-বড় গাছ লাগানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মাঠ ও উদ্যান ফসলের ক্ষতি করবে না এমন গাছ নির্বাচন করা হয়। এভাবে তৈরি বনকে কৃষি বন বলে।

অর্থাৎ একই জমিতে বহুমুখী ফসল, বৃক্ষ, মাছ ও পশু-পাখির খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে কৃষি বন বলা হয়। কৃষি বনে মাঠ ফসল, তাল, সুপারি, নারিকেল, কলা, আম, কাঁঠাল, ইপিল-ইপিল প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়। কৃষি বন অধিক খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ করে।

কাজ : দলগতভাবে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ কর

	প্রাকৃতিক বন	সামাজিক বন	কৃষি বন
কেমন করে সৃষ্টি হয়			
উদ্ভিদের নাম			
প্রাণীর নাম			
উপকারিতা			

নতুন শব্দ : প্রাকৃতিক বন, সামাজিক বন, কৃষি বন, আত্মকর্মসংস্থান, পরিবেশ সংরক্ষণ।

পাঠ- ২ : বিভিন্ন প্রাকৃতিক বনের ধারণা ও গুরুত্ব

মানচিত্রে বাংলাদেশের বনভূমির অবস্থান ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর। বন্ধুর সাথে পর্যবেক্ষণ করে পাহাড়ি বন, গাজীপুর ও মধুপুরের শালবন এবং উপকূলীয় সুন্দরবন শনাক্ত কর। এসব বনকে কেন প্রাকৃতিক বন বলা হয় আলোচনা কর। বাস্তবে বা টেলিভিশনে এসব বন দেখে থাকলে সে সম্পর্কে বলো।

অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুসারে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বন প্রধানত ৩ প্রকার, যথা- পাহাড়ি বন, সমতল ভূমির বন ও উপকূলীয় বন।
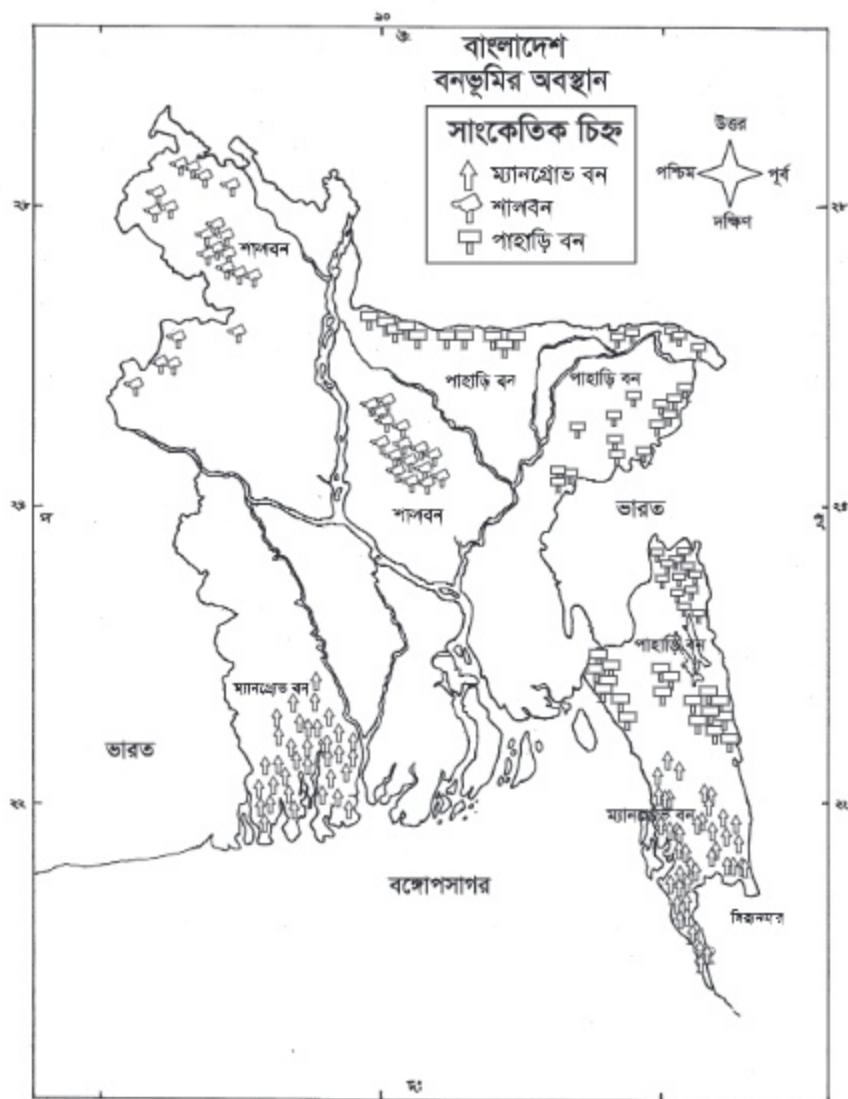
চিত্র : মানচিত্রে বাংলাদেশের বনভূমির অবস্থান

পাহাড়ি বন

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের মধ্যে পাহাড়ি বনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এ বন অবস্থিত। সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার প্রাকৃতিক বন পাহাড়ি বন বলে পরিচিত।

এসব পাহাড়ি বনে গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, শিলকড়ই, গামার প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এসব মুল্যবান বৃক্ষ থেকে উন্নতমানের কাঠ পাওয়া যায়। পাহাড়ি বনে বহু রকমের বাঁশও জন্মায়। এই বনে হাতি, বানর, শুকর, ভালুক, বনমুরগি, হনুমান, অজগর, প্রভৃতি বন্য প্রাণী বাস করে। বিচিত্র ধরনের পাখি ও কীটপতঙ্গও এখানে রয়েছে।

সমতল ভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লার সমতল এলাকায় যে প্রাকৃতিক বন রয়েছে, তা সমতল ভূমির বন হিসেবে পরিচিত। প্রধান বৃক্ষ শাল। তাই এ বনকে শালবন বলা হয়। শাল বৃক্ষ গজারি নামে পরিচিত।

এ বনে গজারি, ছাড়াও কড়ই, রেইনট্রি, জারুল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। নেকড়ে, বানর, সাপ, ঘুঘু, দোয়েল, শালিক প্রভৃতি জীবজন্তু এ বনে বাস করে। মানবসৃষ্ট কারণে সমতল ভূমির প্রাকৃতিক বন দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। বনকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এলাকার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। সে কারণে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

উপকূলীয় বন

সমুদ্র উপকূলে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা বনকে উপকূলীয় বন বলা হয়। এ ছাড়া পরিকল্পিত উপায়ে সমুদ্র উপকূলে সামাজিক বন গড়ে তোলা হলেও তাকে উপকূলীয় বন বলে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরায় উপকূলীয় বন অবস্থিত। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালীর উপকূলীয় বন সুন্দরবন নামে পরিচিত। প্রতিনিয়ত সমুদ্রের জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় বলে একে ম্যানগ্রোভ বনও বলা হয়। সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের মোট আয়তন ৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এ বন পৃথিবীর বৃহত্তম উপকূলীয় প্রাকৃতিক বন। এ বনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অপরূপ।

এ বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরি। এ ছাড়া পশুর, গেওয়া, গরান, কেওড়া, গোলপাতা প্রভৃতি এ বনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ। এ বনের প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার। চিত্রা হরিণ, চিতাবাঘ, বন্য শুকর, বানর, কুমির, ঘড়িয়াল, অজগর এবং নানা প্রজাতির পাখি, কীটপতঙ্গ এ বনে বাস করে। এ বনের বৃক্ষ থেকে প্রাপ্ত কাঠ গৃহনির্মাণ, নিউজপ্রিন্ট তৈরি ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিবছর এ বন থেকে প্রচুর পরিমাণ মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়।

কাজ : নিচের অসম্পূর্ণ চিত্রটি দিয়ে দলীয়ভাবে পোস্টার তৈরি কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

বনের গুরুত্ব
কাঠ পাওয়া যায়
অক্সিজেন দেয়

নতুন শব্দ : শালবন, উপকূলীয় বন, ম্যানগ্রোভ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য, পাহাড়ি বন।

পাঠ-৩ : সামাজিক বন ও বনায়ন

চিত্রের বনের দৃশ্য পর্যবেক্ষণ কর। সামাজিক বনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বলো। বিদ্যালয়ের চারদিকের বাগানকে কী বলে? মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পনা করে যে বন তৈরি করে, তাই সামাজিক বনায়ন। সড়ক ও বাঁধ বন এবং উপকূলীয় মানবসৃষ্ট কেওড়া বন, সামাজিক বনায়নের উদাহরণ। রেইনট্রি, কড়ুই, আকাশমণি, মেহগনি সড়ক ও বাঁধের দুই পাশে লাগানো হয়।

চিত্র : সড়ক ও বাঁধের ধারে বন (সামাজিক বন)

কাজ : নিচের ছকটি দলীয় আলোচনার মাধ্যমে পূরণ কর।

বিভিন্ন প্রকার সামাজিক বনের নাম	কী কী উদ্ভিদ পাওয়া যায়	কী উপকার করে
বসতবাড়ির বন		
বিদ্যালয়ের বন		
সড়ক ও বাঁধ বন		
উপকূলীয় মানবসৃষ্ট বন		

সারা দেশের বনজ সম্পদের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং পরিবেশ রক্ষায় গ্রামীণ জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে সামাজিক বনায়ন করা হয়।

চিত্র : সামাজিক বনের গুরুত্ব

কাজ : উপরের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে দলগতভাবে সামাজিক বনের গুরুত্বের তালিকা তৈরি কর।

এবার আমরা সামাজিক বনের যেসব গুরুত্বের কথা বলেছি, তার সাথে নিচের বিষয়গুলো মিলিয়ে নেই।

সামাজিক বনের গুরুত্ব

- ছায়াঘেরা সুশীতল মনোরম পরিবেশ তৈরি হয়।
- গ্রামের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দেয়।
- কাঠ, জ্বালানি ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে।
- গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- পতিত জমির সঠিক ব্যবহার হয়।
- দারিদ্র্য বিমোচনসহ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

নতুন শব্দ : মানবসৃষ্ট বন, শিল্পের কাঁচামাল।

২০২১

পাঠ-৪ : কৃষি বন ও বনায়ন

কৃষি বনের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর। দলীয় আলোচনা কর এবং চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

চিত্র : ফল গাছ ও মাঠ ফসল (কৃষি বন)

এ রকম একই জমিতে একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন গাছ, ফসল ওপশু-পাখি উৎপাদন হচ্ছে কৃষি বনায়ন। কৃষি বন উপযোগী উদ্ভিদের সংখ্যা অসংখ্য। কৃষি বনে সুপারি, তাল, খেঁজুর, বাবলা, নারিকেল, মেহগনি, ইত্যাদি ফল ও কাঠের গাছ ফসলি জমির আইল বা ফাঁকে ফাঁকে রোপণ করা হয়।

কৃষি বনায়ন পদ্ধতি

আমাদের দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক। সে তুলনায় কৃষি জমির পরিমাণ খুবই কম। সে কারণে এই জমিতে বহুমুখী ফসল ফলানো এখন সময়ের দাবি। ভূমির প্রকৃতি ও স্থানীয় চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন রকম কৃষি বনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। যেমন:

চিত্র : বৃক্ষ ও মাঠ ফসল চাষ পদ্ধতি

১। বৃক্ষ ও মাঠ ফসল চাষ পদ্ধতি

কৃষি বনায়নের এ পদ্ধতিতে একই জমিতে মাঠ ফসলের সাথে বৃক্ষের সমন্বিত চাষ করা হয়। এর ফলে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বেশি হয়।

২। বৃক্ষ ও গোখাদ্য চাষ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে একই জমিতে বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের সাথে পশুখাদ্যের চাষ করা হয়। এতে একদিকে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মাটির ক্ষয় রোধ হয়।
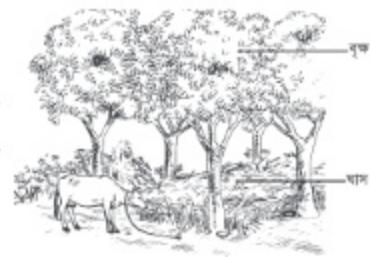
চিত্র : বৃক্ষ ও গোখাদ্য চাষ পদ্ধতি

৩। বনজ ও ফলদ বৃক্ষ চাষ পদ্ধতি

এ ধরনের কৃষি বনায়নে বনজ বৃক্ষের সাথে ফলদ বৃক্ষের চাষ করা হয়। এ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত। এ পদ্ধতিতে জমির বহুমুখী উৎপাদন নিশ্চিত হয়। তাছাড়া জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। পশু-পাখি ও কীটপতঙ্গের আবাস সৃষ্টি হয়, পরিবেশ সংরক্ষিত হয়। উদাহরণঃ ইপিল-ইপিল, নারিকেল, লিচু গাছের সাথে আনারস।

চিত্র : বনজ ও ফলদ বৃক্ষ চাষ পদ্ধতি

কাজ : দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিচের অসম্পূর্ণ চিত্রটি সম্পন্ন কর।

কৃষি বনায়নের গুরুত্ব

- একই জমির বহুমুখী ব্যবহার হয়
- উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
- খামারে কর্মসংস্থান বাড়ে

নতুন শব্দ : কৃষি বনায়ন, সমন্বিত চাষ।

পাঠ-৫ : কৃষি ও সামাজিক বনায়নের পার্থক্য

কৃষিজ ফসল ও বনজ বৃক্ষ একসাথে চাষ করার পদ্ধতিই হলো কৃষি বনায়ন। এ বনায়নের মাধ্যমে কৃষক ভূমির সঠিক ব্যবহার করতে পারে। ফলে উৎপাদন বেশি হয়। কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। সামাজিক বনায়নে গ্রামীণ জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে। বাড়ির আঙ্গিনা, প্রতিষ্ঠান, সড়ক ও বাঁধ, নদী ও খাল পাড় প্রভৃতি জায়গায় বনায়ন করা হয়। জনগণের কল্যাণে জনগণ সৃষ্ট এ বনায়ন সামাজিক বনায়ন নামে পরিচিত।

১ নং চিত্র
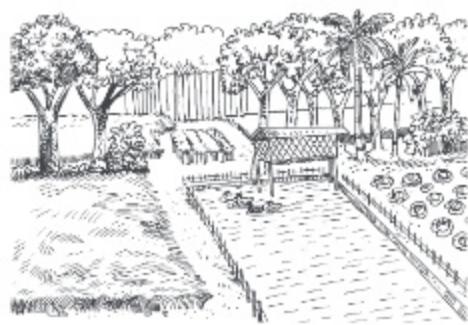
২ নং চিত্র

কাজ

ক) ১ ও ২নং চিত্র দুটি পর্যবেক্ষণ কর। কোনটি কিসের চিত্র তা লেখ?
খ) কোন ধরনের বনায়নে ভুমির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়?
গ) কোন বনায়নের মাধ্যমে একই জমিতে বারবার বহুমুখী ফসল ফলে?
ঘ) কোন বনায়নে জনগণ সরাসরি অংশ নেয়?
ঙ) প্রতিষ্ঠান, বাঁধ, সড়ক ও রেল সড়কের বনায়নকে কী বলে?
চ) কৃষি বনায়নের কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম লেখ।
ছ) সামাজিক বনায়নের দুইটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম লেখ।
জ) উপকূলীয় অঞ্চল ও পাহাড়ি পতিত জমিতে কী ধরনের বনায়ন হয়?

কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক
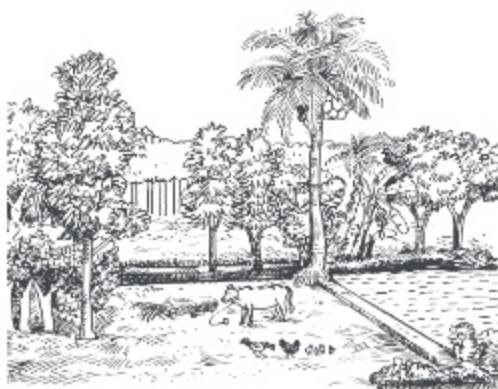
চিত্র: কৃষি বনায়ন

চিত্র: সামাজিক বনায়ন

১. কৃষি বনায়নের মাধ্যমে একই সাথে ফসল, বৃক্ষ, মাছ ও পশু-পাখির খাদ্য উৎপাদন করা যায়। তবে একই সাথে বৃক্ষ ও ফসল উৎপাদনকে কৃষি বনায়ন বলা হয়। কিন্তু সামাজিক বনায়নের ফলে কেবল কাঠ ও ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়।

২. সামাজিক বনায়নের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণিবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়। গ্রামীণ জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন করে থাকে। জনসাধারণের চেষ্টায় সৃষ্টি হয় সামাজিক বন। কৃষি বনায়নে কাঠ ও ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের পাশাপাশি মাঠ ফসল চাষ করা যায়।

৩. কৃষি বনায়নে একই জমি বারবার ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে শস্য উৎপাদন করা হয়। এর ফলে বেশি ফসল পাওয়া যায়। জমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। সামাজিক বনায়নে একই জমি একাধিকবার ব্যবহারের সুযোগ কম।

৪. কৃষি বনায়নের মাধ্যমে কৃষি খামার, মৎস্য খামার, মৌমাছি চাষ, রেশম চাষ করা যায়। ফলে খাদ্য, বস্ত্রসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ বাড়ে। অপর দিকে সামাজিক বনায়নের ফলে মূল্যবান কাঠ ও নানা রকম ফল পাওয়া যায়।

৫. সড়ক, রাজপথ, বাঁধ ও রেলপথে সামাজিক বনায়ন করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজারেও সামাজিক বনায়ন করা হয়। ফসলি মাঠ, বাড়ির আঙ্গিনা, পাহাড়ি পতিত জমি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি বনায়ন করা হয়। আজকাল বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক বনেও সামাজিক বনায়ন ও কৃষি বনায়ন করা হচ্ছে। যেমন : মধুপুর ও ভাওয়ালের শালবন।

কাজ : কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ কর।

পার্থক্যের বিষয়ে প্রশ্ন	কৃষি বনায়ন	সামাজিক বনায়ন
১. এ ধরনের বনায়ন কোথায় করা হয়?		
২. ৫টি উৎপাদিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম লেখ।		
৩. কাদের অংশগ্রহণের ফলে সৃষ্টি হয়?		
৪. জমির ব্যবহার কীভাবে করা হয়?		
৫. সুবিধা কী কী?		
৬. তুমি কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পার?		

নতুন শব্দ : উদ্ভিদ ও প্রাণিবান্ধব পরিবেশ, কৃষি খামার।

পাঠ - ৬ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এসব বনের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ ভূমিতে বন থাকা অপরিহার্য। আমাদের দেশে বর্তমানে বনের পরিমাণ মোট আয়তনের ১৭ ভাগ। সুতরাং দেশের বনজ সম্পদ বাড়ানোর জন্য কৃষি বন এবং সামাজিক বনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এবার দেখা যাক এসব বন কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখে।

১. বনের গাছপালা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন পরিবেশে ছেড়ে দেয়। ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে।
২. এসব বনের গাছপালা বাতাসে জলীয়বাষ্প সরবরাহ করে। ফলে পরিবেশ ঠাণ্ডা থাকে। এ জলীয় বাষ্প মেঘ ও বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে।
৩. আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতা হ্রাস করে। বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. এসব বন মাটিকে উর্বর করে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ রক্ষা করে।
৫. জীবজন্তুর খাদ্য উৎপাদন করে এবং আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে।
৬. ভূমিক্ষয় ও ভূমিধস থেকে পরিবেশ রক্ষা করে।
৭. টর্নেডো, ঝড় জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে জনপদ রক্ষা করে।
৮. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে।

কাজ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কৃষি ও সামাজিক বনের অবদান সম্পর্কীয় মানচিত্র তৈরি কর।

নতুন শব্দ : পরিবেশের ভারসাম্য, চরমভাবাপন্ন, জীববৈচিত্র্য।

পাঠ-৭ : বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণের নিয়মাবলি

বসতবাড়ির চারপাশে নানারকম গাছপালা লাগানো হয়। বাড়ির আঙ্গিনায় বিভিন্নরকম সবজি চাষও করা হয়। এর ফলে বাড়িতে ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ রকম পরিবেশে দেহ ও মন সুস্থ থাকে। বাগানের বিভিন্ন রকম ফল ও সবজি বাড়ির লোকজনের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। অতিরিক্ত উৎপাদিত দ্রব্যাদি পরিবারের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনে দেয়।

চিত্র : বসতবাড়ির গাছপালা

চিত্র : বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ
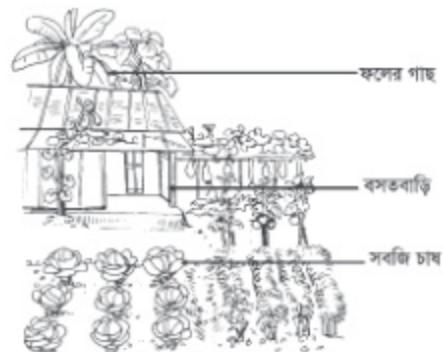
বসতবাড়িতে প্রধানত ফল জাতীয় গাছ যেমন : আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি, পেয়ারা, কুল প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়। অনেক বাড়িতে নানা রকম কাঠের গাছ যেমন : সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি গাছ লাগাতে দেখা যায়। এ ছাড়া বসতবাড়ির আঙ্গিনায় লাউ, শসা, শিম, পুঁইশাক, বেগুন, টমেটো, মরিচ জাতীয় সবজি চাষও করা হয়।

কাজ : তোমাদের বসতবাড়ির আঙ্গিনায় যেসব গাছপালা আছে তার তালিকা দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর

বসতবাড়িতে গাছ লাগানোর সময় যেসকল বিষয় লক্ষ রাখতে হবে, তা হলো :

১. বসতবাড়ি হতে দূরে গাছপালা লাগাতে হবে। যাতে গাছের মরা ডাল ও পাতা ঝরে বসতবাড়ির টিনের চালা ও ছাদের ক্ষতি করতে না পারে।
২. বাড়িতে আলো-বাতাস প্রবেশে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
৩. ঝড় তুফানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেন জীবনহানি করতে না পারে।
৪. গাছপালা যেন বসতবাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে মনোরম পরিবেশ তৈরি করে।

বসতবাড়ির বৃক্ষরোপণের বিভিন্ন নিয়মাবলি

- পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ছোট ও মাঝারি আকারের গাছ যেমন- পেয়ারা, আতা, শরিফা, মেহেদী, জবা ইত্যাদি গাছ লাগাতে হবে। কারণ দক্ষিণ ও পূর্ব দিক দিয়ে বাড়িতে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে।

- দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে শক্ত ও পাতাঝরা গাছ লাগাতে হবে। যেমন: সুপারি, নারিকেল, শিশু, সেগুন ইত্যাদি। এসব গাছের ডালপালা কম ও শীতকালে পাতা ঝরে যায়। ফলে বাড়িতে পর্যাপ্ত রোদ আসতে পারে।

সব রকমের বড় গাছ
উত্তর
সব রকমের বড় গাছ
সব রকমের বড় গাছ
শক্ত ও পাতা ঝরা গাছ
পশ্চিম
ছোট ও মাঝারী গাছ
পূর্ব
শক্ত ও পাতা ঝরা গাছ
দক্ষিণ
ছোট ও মাঝারি গাছ
ছোট ও মাঝারি গাছ

চিত্র : বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণের নকশা

- বাড়ির উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে সব রকমের বড় গাছপালা লাগানো যায়। যেমন: আম, কাঁঠাল, জাম, মেহগনি, কড়ই ইত্যাদি। এসব বড় বড় বৃক্ষ কালবৈশাখীর হাত থেকে আমাদের বাড়িঘরকে রক্ষা করে।

- বাড়ির উত্তর-পশ্চিম দিকে ফাঁকা জায়গা বেশি থাকলে বাঁশ লাগানো যেতে পারে। কারণ গ্রামীণ জীবনে বাঁশের ব্যবহার বেশি হয়। তাছাড়া বাঁশের অর্থনৈতিক গুরুত্বও বেশি।

- এছাড়াও বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বিভিন্ন শাকসবজি চাষ করা যায়। ধুন্দল, মেটে আলু, শিম, ঝিঙ্গা, গোলমরিচ ইত্যাদি লতানো উদ্ভিদগুলো মাঝারি উচ্চতার গাছে জন্মানো যায়। তাছাড়া বাড়ির ছায়াযুক্ত স্থানে আদা, হলুদ, মানকচু ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে।

কাজ : বসতবাড়িতে গাছপালা লাগানোর সময় কী নিয়ম মানতে হয় তা আলোচনা করে লেখ।

নতুন শব্দ : পাতাঝরা বৃক্ষ, কালবৈশাখী ঝড়।

পাঠ-৮ : বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা

সব জায়গায় বৃক্ষরোপণের নিয়ম প্রায় একই রকম। বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণের জন্য মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হওয়ার এক মাস আগে গর্ত করতে হবে। গর্তের আকার হবে (৫০ সেমি X ৫০ সেমি X ৫০ সেমি)। গর্তে মাটির সঙ্গে ১০ কেজি গোবর সার, ৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালো করে মেশাতে হবে। সার মেশানো মাটি গর্তে কমপক্ষে এক মাস রেখে দিতে হবে। এক মাস পর যখন মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হবে, তখন ভালো নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করে রোপণ করতে হবে।

পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা রোপণের ধাপগুলো চিত্রে দেখানো হলো
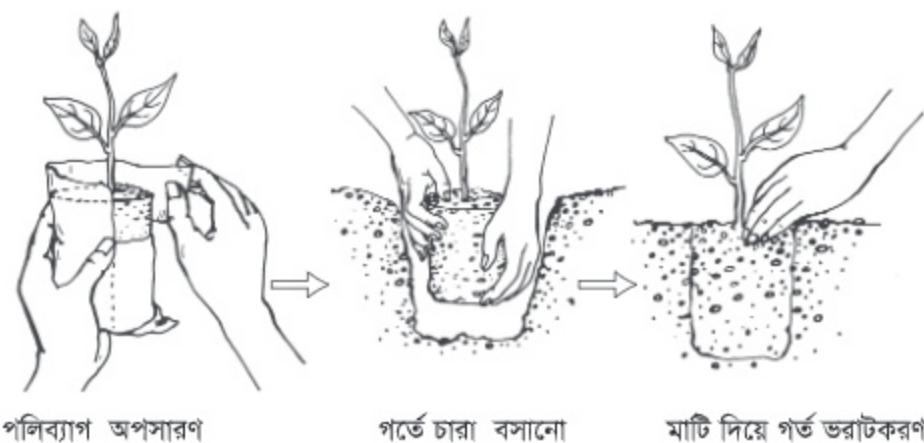
চিত্র : পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা রোপণের বিভিন্ন ধাপ

চারা লাগানোর সময় প্রয়োজনীয় সাবধানতা

১. সতর্কতার সাথে পলিব্যাগটি ধরে একটি ধারালো ব্লেড বা ছুরি দিয়ে পলিব্যাগটি কেটে অপসারণ করতে হবে।
২. খেয়াল রাখতে হবে চারার গোড়ার মাটি যেন ভেঙে না পড়ে।
৩. চিত্রের মতো করে চারাটি সাবধানে গর্তে বসিয়ে মাটি দিয়ে চারদিকের ফাঁকা অংশ ভরাট করে দিতে হবে।
৪. লাগানোর সময় চারাটির সবুজ অংশ যাতে মাটিতে ঢেকে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
৫. চারার গোড়ার মাটি একটু উঁচু করে দিতে হবে, যাতে গোড়ায় পানি জমতে না পারে।

চারার পরিচর্যা

পানি সেচ
সহায়ক খুঁটি ও মালচিং
চারা রক্ষা বেড়া

চিত্র : চারা পরিচর্যার বিভিন্ন ধাপ

চারার গোড়ার আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। শীতকালে মাটির রস ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য চারার গোড়ায় খড়কুটা বিছিয়ে মালচিং করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে বিকেলে নিয়মিত পানি সেচ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

চারার বৃদ্ধি ভালো না হলে ৩-৪ মাস পরে সার প্রয়োগ করতে হবে। চারাপ্রতি ৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার দিতে হবে। চারার গোড়া থেকে ১২-১৫ সেমি দূরে চারার চারদিকে সরু শক্ত কাঠি দিয়ে ৮-১০টি গর্ত করতে হবে। এ গর্তসমূহে ৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার সমান ভাগ করে দিতে হবে। এভাবে সার প্রয়োগ করাকে ডিবলিং পদ্ধতি বলে। মাটি শুকনো থাকলে সার দেওয়ার পর যথেষ্ট পরিমাণ পানি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। প্রতিবছর বর্ষার শুরুতে একবার এবং বর্ষার শেষে একবার সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রতিবার ইউরিয়া ৭৫ গ্রাম, টিএসপি ৫০ গ্রাম এবং এমওপি ৫০ গ্রাম করে ডিবলিং পদ্ধতিতে চারার গোড়ায় সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের পরের ৩ বছর এভাবে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

কাজ : বিদ্যালয়ের বাগানে দলগতভাবে চারা রোপণ কর।

নতুন শব্দ : মালচিং, ডিবলিং।

পাঠ- ৯ : বসতবাড়ির ছাদে, টবে ও বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা

চিত্র : বাড়ির ছাদে টবে বাগান

চিত্র : : বিদ্যালয়ে বাগান

বাড়ির ছাদে ও টবে লাগানোর উপযোগী গাছ

লেবু, কমলা, পেয়ারা, বিলিম্বি, কামরাঙ্গা, ডালিম, আম্রপালি, আম প্রভৃতি ফল গাছ। প্রায় সব রকমের ফুল গাছ বাড়ির ছাদে টবে চাষ করা যায়। লাউ, মরিচ, টমেটো, পুঁইশাক, বেগুনসহ বিভিন্ন রকম সবজির চাষ বাড়ির ছাদে টবে করা যায়।

> **কাজ :** তোমাদের বিদ্যালয়ে কী কী ফল, ফুল ও কাঠ উৎপাদনকারী গাছ রয়েছে? তালিকা কর।

টবে চাষ পদ্ধতি

গাছ লাগানোর টব বিভিন্ন রকম ও আকারের হয়ে থাকে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, গাছের আকার টবের আকারের উপর নির্ভরশীল।

৪৫ সেমি একটি টবের জন্য মাটি তৈরির নিয়ম

টবে চারা লাগানোর পূর্বে ২ ভাগ দোআঁশ মাটি ও ১ ভাগ গোবর সার একসাথে মেশাতে হবে। ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালো করে মিশিয়ে ১৫ দিন রেখে দিতে হবে। এবার টবের ঠিক মাঝখানে কলম বা চারা রোপণ করতে হবে।

চিত্র : ছাদে স্থায়ী বেড

স্থায়ী বেড পদ্ধতি

আমাদের দেশে বাগান করার জন্য বর্তমানে এটি একটি আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ছাদের চারদিকে ২ মিটার প্রস্থের দুই পাশে ৫০ সেমি উঁচু দেয়ালে ১৫ সেমি গাঁথুনির নেট ফিনিশিং ঢালাই দিয়ে তৈরি করতে হয়। মাঝখানে খালি জায়গার তলায় ৫ সেমি ইটের শুরকির পরে ৫ সেমি গোবর সার দিতে হয়।

এবার ২ ভাগ দোআঁশ মাটি ও ১ ভাগ গোবর সার মিশিয়ে ভরাট করে স্থায়ী বেড তৈরি করা হয়। ছাদ ঢালাই ও দেয়াল গাঁথুনির প্রতিটি ক্ষেত্রে নেট ফিনিশিং দিতে হয়। এতে ছাদের কোনো রকম ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

টব বা ছাদের গাছের পরিচর্যা

১ কেজি পঁচানো খইলের সাথে ৩ লিটার পানি মিশিয়ে মধ্যম তরল তৈরি করতে হবে। ৪৫ সেমি টবের জন্য আধা লিটার, ড্রাম বা স্থায়ী বেডের জন্য ১ লিটার পরিমাণ দিতে হবে। ১৫ দিন পরপর নিয়মিত এ সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। তরল সার প্রয়োগের ১ ঘণ্টা আগে ও এক ঘণ্টা পরে পানি দিতে হবে।

টবে লাগানো দীর্ঘজীবী গাছে নিয়মিত সেচ ও সার প্রয়োগ করতে হবে। এমনভাবে পানি দিতে হবে, যাতে টবের মাটিতে সর্বদা রস থাকে। সপ্তাহে দুইবার গাছের গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাগান

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে ফুল, ফল ও কাঠের গাছ রোপণ করা হয়। এ বাগানে কৃষ্ণচূড়া, কাঁঠালিচাপা, সোনালু, বাগান বিলাস, জারুল, গন্ধরাজ, জবা, টগরসহ নানা রকম ফুলের গাছ লাগানো হয়। আবার মেহগনি, রেইনট্রি, আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি কাঠ ও ফলের গাছ রোপণ করা হয়।

আমাদের দেশে বিশেষ করে শীতকালীন ফুল বাগান খুব সুন্দর হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি ও সৌন্দর্য বর্ধনে এ ধরনের বাগান করা অপরিহার্য।

> কাজ : [দলীয় কাজ]
> বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে রোপণ করা যায় এরকম পাঁচটি করে স্থায়ী বনজ, ফলদ ও স্থায়ী ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের নাম লেখ।
>
> **কাজ :** সকল বিদ্যালয় ফুলবাগান ও গাছপালা ঘেরা মনোরম পরিবেশ থাকা উচিত কেন? তা দলীয় আলোচনা করে পয়েন্ট আকারে পোস্টার কাগজে লেখ। শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : স্থায়ী বেড, দীর্ঘজীবী গাছ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বন .... প্রকার।

২. উপকূলীয় বন থেকে প্রচুর পরিমাণে .... ও .... সংগ্রহ করা হয়।

৩. বসতবাড়ির দক্ষিণ ও পুর্ব দিকে .... ও .... গাছ লাগানো উচিত।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. জনগণের কল্যাণে জনগণ সৃষ্ট বনায়ন	নিয়মিত সেচ ও সার দিতে হয়।
২. কৃষি বনায়নে বনজ বৃক্ষের সাথে	সবজির চাষ ছাদের টবে করা যায়।
৩. মরিচ, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি	ফলদ বৃক্ষের চাষ করা হয়।
৪. টবে লাগানো দীর্ঘজীবী গাছে	সামাজিক বনায়ন নামে পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উপকূলীয় বন কাকে বলে?

২. সামাজিক বনের দুইটি গুরুত্ব লেখ।

৩. বাড়ির ছাদের টবে লাগানো যায় এমন তিনটি গাছের নাম লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পাহাড়ি বন ও সামাজিক বনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা আলোচনা কর।

৩. পলিব্যাগের চারা রোপণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উপকূলীয় বনের প্রধান বৃক্ষ কোনটি?

ক. গরান খ. জারুল

গ. গর্জন ঘ. গেওয়া

২. বাড়ির দক্ষিণ ও পুর্ব দিকে নিচের কোন গাছ লাগানো হয়?

ক. শরিফা খ. শিশু

গ. জলপাই ঘ. সেগুন

৩. নিচের কোনটি সামাজিক বনের বৃক্ষগুচ্ছ?

ক. কড়ই, আকাশমণি, গামার খ. জারুল, রেইনট্রি, মেহগনি

গ. মেহগনি, আকাশমণি, কড়ই ঘ. কড়ই, গর্জন, মেহগনি

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সালমা বেগম নিজ বাড়ির ছাদে ৪৫ সেমি আকারের ২০টি টবে বিভিন্ন প্রজাতির ফল ও ফুলের চারা রোপণ করে নিয়মিত পরিচর্যা করেন। তার বাগানে এখন মৌসুমি ফল ও ফুলের সমারোহ।

৪. সালমা বেগমের টবগুলোর জন্য কত কেজি টিএসপি সারের প্রয়োজন?

ক. ১ কেজি খ. ২ কেজি

গ. ৩ কেজি ঘ. ৪ কেজি

৫. সালমা বেগমের উদ্যোগটি-

i. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে

ii. পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে

iii. পরিবারের ব্যয় বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রহিমা বেগম বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণের নিয়মাবলি অনুসরণ করে বাড়ির বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রজাতির যেমন : নারিকেল, শিশু, পেয়ারা, জাম ইত্যাদি গাছ রোপণ করেন। আর এভাবেই নিজ বাগান থেকে পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ক. বন কাকে বলে?

খ. সামাজিক বনের একটি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. রহিমা বেগম উদ্দীপকে উল্লিখিত গাছপালা বাড়ির কোন দিকে রোপণ করেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রহিমা বেগমের উদ্যোগটি কীভাবে তার সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

২.
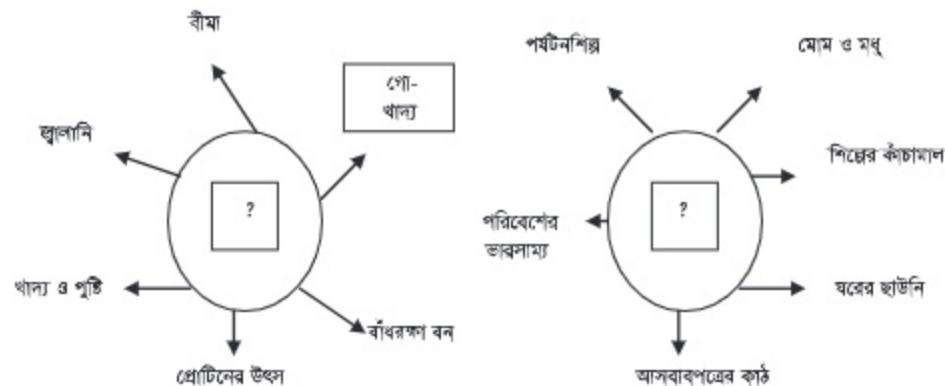
চিত্র : ক চিত্র : খ

ক. পাহাড়ি বন কাকে বলে?

খ. কোন বনকে শালবন বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের চিত্রের কোন বনটির ভূমিগত বৈশিষ্ট্য ভিন্নতর? কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপরের কোন বনটি সামাজিক বনায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? কারণ বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ষষ্ঠ–কৃষিশিক্ষা

জীবসেবা পরম ধর্ম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।